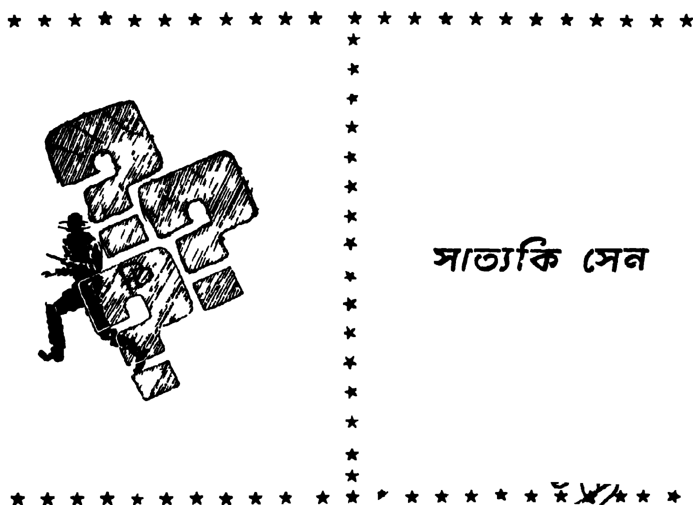


শুভেন,/ বিকাশ,/ সনাতন—তিনজনেই খুন হলো। কিন্তু কেন? শুভেনবাবুর খুনের মাঝে পাপিয়াকে গুম করা হলো। কিন্তু কেন? কোথায় গেল সে? পুলিশ ঠিক করতে পারল না খুনের জন্যে গুম, না গুমের জন্যে খুন। কোকেন, সোনা এ সবের স্মাগলিঙ করত কি রূপেনবাবু—শুভেনবাবুর পার্টনার? পুলিশ যখন এ সবের ঠিক কিনারা করতে পারছিল না, ঠিক তখনই আবার খুন করা হল সনাতনকে। তারপর কি হলো?

অতল সৈকতে



সাত্যকি সেন

নতুন প্রকাশক
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ

প্রকাশিকা
এ. দত্ত
২৪ সি, রাম কমল সেন লেন,
কলকাতা-৭

ছেপেছেন
নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাত টাকা

TATAL SAIKATE

A Bengali Novel By

· SAT [illegible]

F [illegible] only

সেদিন…

…মেঘের দল আকাশের বেশীর ভাগ কোণ জুড়ে ছিল। সঙ্গে হাওয়া। আশা ছিল তবু, বৃষ্টিদলের উর্দ্ধলোক থেকে পতন অনিবার্য নয়। অবশ্য এ ভাবনাটা, অনেক লোকের অনেক রকমের আশা মিলিয়ে সান্তনার পর্য্যায়ে এসে ঠেকেছিল।

অমিতাভও সেদিন বেড়িয়েছিল বাড়ী থেকে সেই দলেরই একজন হয়ে। ওর আশা ছিল প্রকার ভেদে সেই একই,—বোধহয় বৃষ্টি নামবে না। সুতরাং আড্ডাটা জমবে বেশ অন্যান্য দিনের মত। তাছাড়া মেঘ জমলে, বৃষ্টি নামলেও ঘরে থাকা কষ্টকর ; বিশেষ করে বিকেলের পর। এ সময়ের বৃষ্টিতে "মন মোর মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে চলে…" বলে ভাবতেই মন চায় না। মনে পড়ে ছোট বেলার কথা। সকাল, দুপুর, বিকেল—এই তিনটে সময়ে বৃষ্টি নামলেই ছাদে গিয়ে শুরু হত ভেজার পালা। খুব ভালো লাগত কিন্তু। মা বকতেন—অসুখে পড়লে কে দেখবে শুনি ?

পূজোর আর কদিন বাকী। মহালয়ার দিনও তাই এগিয়ে এসেছে। আকাশে, বাতাসে, আলোর ঝলকানি। গ্রামদেশের কাশ আর শিউলীতে এসময় যেমম কথা বলে—এ শহরের ইঁট, কাঠ আর ব্যস্ততায় তার খোঁজও পাওয়া যায় না। এখানে শুধু ক্যালেণ্ডারের কালোর মাঝে লাল হরপে ছাপা তারিখের দিকে চেয়ে মনে করতে হয় দুর্গাপূজার সময় আসন্ন। বেচা আর কেনা। এই দু'য়ে মিলে শুরু হয় সাজের মহড়া। এ উৎসবের সুযোগে শরীর নতুন সাজে নিজেকে মোহময় করে তোলে। আর সহর সাজে মাইক-প্যাণ্ডেলের চুমকিতে।

'সুদক্ষিণা' ! বই-এর দোকান। সেখানে বেশ ভীড়। পূজা বার্ষিকী—আগামী ছুটীর খোরাক। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সেখানেও যেন আগামী উৎসবের ঝিলিক রয়েছে বিকিকিনির ব্যস্ততায়। বাইরের লম্বা তাকটায় সাজান রয়েছে হরেক রকমের ইংরেজী বই।

ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে অমিতাভ বই দেখছিল। হঠাৎ মিহি গলার উছল জান্তব চীৎকারে ঘাড় ফেরায় সে। বছর চোদ্দ পনের বয়স হবে ফ্রক পড়া মেয়েটির। সঙ্গে দু'তিনটি সেই বয়সেরই সাথী। 'বিটলদের এলুয়াল' বইএর ছবি দেখতে দেখতে সে-ই এ শব্দটা বার করছে গলা থেকে। কার যেন ছবিটা দেখে 'ও কিউট' বলে ছবির উপর সশব্দ চুম্বন করে।

বিগড়ে যায় অমিতাভর মন।

বাতাসের সঙ্গে গুড়িগুড়ি জলের ফোঁটা গায়ে এসে লাগে। দোকানের ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ওঠেন, পণ্ডিত, বই তোল। বই তোল। বৃষ্টি এসে গেছে।

আকাশের দিকে তাকায় অমিতাভ। কালো তার চেহারা। নেই কোন তারার পাত্তা। ভীড় আস্তে আস্তে কমে আসে দোকানে।

দোকান ছেড়ে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে অমিতাভ। কিছুদূর এগিয়ে যেতে বৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও ঘনত্ব যায় বেড়ে। আর এগোনো যায় না। দাঁড়িয়ে পড়ে অমিতাভ ছোট্ট কার্ণিশ দেওয়া এক বাড়ীর বন্ধ গেটের এক চিলতে আশ্রয়ে—অর্ধসিক্ত অবস্থায়।

চমকে চমকে বিদ্যুৎ। গমকে গমকে গম্ভীর গর্জন। সাথে চলে এক খ্যাপা বৃষ্টির মাতন, হাওয়ার সাথে চুক্তি করে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ যেন মেপে নিতে চায় এ বর্ষণের স্থায়ীত্ব। বৃষ্টি হাওয়ার সওয়ারী হয়ে এক ঝলক ধাওয়া করে সেই ছোট্ট গা-বাঁচান আশ্রয়স্থলে। প্রকৃতি তার শিল্পীর খেয়ালে যেন আরেক প্রস্থ জল লেপন করে।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। একটানা, এক শব্দে চলে তাদের উদ্দামতা। দোকানগুলো হতাশ হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আলো বন্ধ করে দরজা টেনে দেয়। কোন কোন দোকানের আবার আধটানা দরজা দিয়ে ভিতরের আলো পড়ে বাইরের জলে-ভেজা চকচকে রাস্তায়। গাড়ীগুলো যেন হুশ হুশ করে দৌড়ে পালায়।

তিড়তিড় করে জল জমে উঠছে শহর কলকাতার এই বিখ্যাত সড়কে। হয়তবা জল জমে একাকার হয়েছে অনেক রাস্তায়ই। অমিতাভ মনে মনে বিরক্তি বোধ করে আসন্ন অসুবিধার কথা ভেবে। রাত বেড়ে চলে ঘড়ির কাঁটার মাপে।

অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর নিরাশ হয়ে অমিতাভ ঠিক করে যে, ভিজতে ভিজতেই বাড়ীর পথে রওনা দেবে। আর এই প্রায় ভেজা-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগে হাওয়ার হানাদারীতে।

ঘন বৃষ্টির মাঝে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আসার পথে আশ্রয়স্থলের আরেক কোণায় দৃষ্টিটা স্থির হয়। ভালো করে একবার চায় তার দিকে। যার ছায়া তার চোখের কোণে পড়েছিল এখানে দাঁড়াবার সময়, এ সেই না ?

কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। হাতে কাগজে মোড়া বাণ্ডিলের স্তূপ। পূজোর সওদা হবে হয়ত। রাস্তার আলোর ছিটকে আসা স্তিমিত ব্যপ্তিতে নজরে পড়ে কালো পাতার গণ্ডীতে ঘেরা চকচকে দুটি কালো চোখের তারা। বৃষ্টির মতই অস্থির। হাত ঘড়িতে অমিতাভ দেখে ঘড়ির কাঁটাটা সাড়ে আটে দিয়েছে হানা।

বৃষ্টি হয়ে চলেছে তখনও একই ভাবে। সেই আলো-আঁধারীতে দাঁড়িয়ে থাকা চঞ্চল মানুষটির দিকে চায় অমিতাভ। বুঝিবা তার অসহায় মুখ চোখে পড়ে। মনের দ্বিধা সরিয়ে ফেলে কোণের দিকে জড়সড় মানুষটিকে জিজ্ঞেস করে অমিতাভ।

আপনি বাড়ী যাবেন না? রাত অনেক হয়েছে। তাছাড়া বৃষ্টি থামবে বলেও মনে হয় না।

তাইত দেখছি।

বৃষ্টির নিরবিচ্ছিন্ন ঐকতানের মাঝে ভেসে আসে ছোট্ট জবাব। একটু পরে ভেসে আসে আবার, কি করে যাব তাই ভাবছি। এমন বৃষ্টি নামবে কে আগে ভেবেছিল।

বৃষ্টি নামতে নামতে একটা ট্যাক্সী বা রিক্সা…কথাটা সম্পূর্ণ করে না অমিতাভ।

সে চেষ্টাই ত করছিলাম। নইলে এতগুলো জিনিষপত্র নিয়ে বাড়ী যেতামই বা কি করে। কিন্তু বৃষ্টিটা তখনই এত জোরে এল··

কারণ জানিয়ে যেন অনুযোগ করে মিষ্টি স্বরের গলাটা।

ও।

কিছুক্ষণের বাকস্তব্ধতা ভেঙে অমিতাভ আবার বলে, এখন ত রিক্সাও পাবেন না বোধহয়।

তাই ভাবছি। ভিজেই চলে যেতাম। কিন্তু এই জিনিষগুলো নিয়েই ত মুস্কিলে পড়েছি।

অমিতাভ দুএক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলে, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলব?

বলুন।

আমি যদি আপনার বোঝাটা ভাগাভাগি করে নিয়ে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি, তাহলে···

উৎসুকভাবে অমিতাভ প্রস্তাবের জবাব চায়। বাদলের নেশা বুঝি তাকে বিভোর করে তুলেছে।

আপনি···

সঙ্কুচিত স্বরের কথাটিতে বাধা দিয়ে মৃদু হাসির রেশ মিশিয়ে বলে অমিতাভ, অবশ্য আপনার জিনিষপত্রগুলোকে ভেজার হাত থেকে বাঁচাতে পারব—এমন গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারব না।

না না, আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছিলাম, আপনি আবার আমার জন্যে ভিজে কষ্ট করবেন কেন?

দ্বিধা লজ্জা জড়িত স্বরে কথা ভেসে আসে অপর কোণটি থেকে।

তাতে কি হয়েছে।

কিছু যে নেই না সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাকে আমিই বা কি করে কষ্টটা স্বীকার করতে বলি, বলুন ত?

মৃদু হাসির রেশ লাগান মৃদু কথা বৃষ্টির কলতানের মাঝে ভেসে আসে।

আপনার অসহায়ভাবে এই বিপদে পড়াটাই ত তার যথেষ্ট জবাব। আর, ভিজে বাড়ীর দিকে রওনা ত আমাকেও দিতেই হ'ত। তাছাড়া, বৃষ্টিতে ভিজতে আমার খারাপ লাগে না। বেশী ভিজলেও না।

আমারও।

ঝলকে ওঠা চোখ নিয়ে আরো বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল মানুষটি, পছন্দের ছন্দ মিলিয়ে। কিন্তু একটু থেমে প্রসঙ্গান্তরে আবার বলে ওঠে, কিন্তু…

মনের দ্বিধা উড়িয়ে দিতে অমিতাভ বলে—উপরন্তু বিশ্বাস করতে পারেন আমায়। কারণ, বাঘ বা সিঙ্গি কোন দলেরই আমি নই।

না, না, সে কথা নয়। মানে…

ঠিক আছে। চলুন এবার। আপনার বাড়ীর লোকজন নিশ্চয়ই ভাবছেন। অনেক রাত হয়েছে। তার উপর আবার রাস্তায় আরো জল জমে গেলে বেশী অসুবিধা হবে।

আচ্ছা চলুন।

অমিতাভ হাতের ঘড়িটা খুলে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রাখে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিনিষপত্রগুলির ভাগ নিতে নিতে বলে, এগুলো কিন্তু একেবারে ভিজে যাবে।

যাক। এখন বাড়ী পেঁাছতে পারলে বাঁচি। বৃষ্টিটা হবে না বলে ভেবেছিলাম—

আমিও ত তাই ভেবেছিলাম।

হাসতে হাসতে অমিতাভ জানায়। তারপর বলে, চলুন এবার।

হ্যাঁ।

রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করে তারা সেই বৃষ্টির মাঝে। বরিষণ মুখরিত রাত্রি। কলকাতা শহরের বৈশিষ্ট্যে পথে তখন বেশ জল জমে উঠেছে। আস্তে আস্তে জল ঠেলে তারা এগিয়ে চলে।

অমিতাভ চলতে চলতে পাশের সিক্ত মানুষটির দিকে তাকায়। করপোরেশনের বাতির ম্রিয়মান আলো ঠিকরে পড়েছে মুখে। মাথার চুলগুলো ভিজে লেপ্টে গেছে। জল গড়িয়ে আসার পথে চুলের একটি চির খাওয়া ছোট্ট গুচ্ছ যেন এলিয়ে পড়েছে ডান গালের উপর। কয়েকটা পড়েছে আবার কপালে। মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে কালো চোখ দুটি তুলে চায় পার্শ্বচারিণী অমিতাভর দিকে। মৃদু হাসির রেখা ঠোঁটে টেনে নিয়ে বলে, আপনি কোথায় থাকেন?

অমিতাভকে শুধায় সে সুরেলা স্বরে নিঃশব্দ পদচারণার মাঝে।

এস. এন. বোস রোডে। আপনি?

আমি? আমি সাউদার্ণ প্লেসে থাকি।

ক্ষণেক পরে আবার অনুযোগ করে নাম না জানা মানুষটি।

দেখুন ত আমার জন্যে মিছিমিছি এতটা কষ্ট করতে হল। আর আমিও···

কথা থামিয়ে অমিতাভ বলে, মিছিমিছি কোথায়? কারণটা ত বৃষ্টি। আর এটুকু কষ্ট ত আগেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগেই ত বলেছি, ভিজতে আমার বেশ লাগে।

তবু—

নইলে ওখানে এগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে সারারাত কাটাতে হত। সেটা নিশ্চয়ই খুব আরামের হত না।

হাসতে হাসতে বলে অমিতাভ।

না, অতটা হয়ত করতে হত না। যাক গে, ও কথা থাক।

সেই ভাল।

রাস্তা পেরুতে হবে। ফুটপাতের সীমানায় পা দিয়ে ঠাহর করে নিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ায় অমিতাভ। হাত ধরে ওকে নিরাপদ সীমানায় নিয়ে আসে—একাকার রাজত্বের মাঝে।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়। বৃষ্টির ঐকতানের মাঝে তাদের জল ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার শব্দ যোগ হয়। এক ঝলক হাওয়া বয়ে যায়। শিউরে উঠে শাড়ীর আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নেয় সে।

ঠাণ্ডা লাগছে ? [redacted]

না [redacted]

চোখ তুলে অস্ফুট হাসির সঙ্গে জানায় সঙ্গিনী।

জল পড়ে পাতা নড়ে। অমিতাভর মনটা কেন যেন লঘু হয়ে উড়ে যেতে চায়। সেই সাথে সাড়া দেয় যেন মাঝে মাঝে বয়ে আসা হাওয়াটা। ঝলকে ঝলকে বৃষ্টি যেন নিজের পুলক জানিয়ে যায় ওর মুখে চোখে। জলের ঝলক, হাওয়ার পালক।

নিঃশব্দে আবার তারা চলতে থাকে উদ্দেশ্য স্থানের উদ্দেশ্যে। সেই নীরবতার মাঝে অমিতাভ বলে ওঠে—এতটা পথ এলাম, আপনার নাম এখনও জানা হল না।

পাপিয়া রায়।

বাঃ! আপনার ডাক নাম নিশ্চয়ই পিউ।

নিজের পছন্দসই নাম তৈরী করে অমিতাভ।

না, ঐ নামে আপনিই প্রথম ডাকলেন। মা পাপিয়া বলে ডাকেন। তবে বাবা অবশ্য আদর করে পাপি বলেন।

যখন আমাকে ডাকেন 'পাপি পাপি' বলে, তখন আমার ভীষণ হাসি পায়। আপনার পাচ্ছে না?

দুজনে সশব্দে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

আকাশের রঙ তখন মেঘের পর্দায় ধূসর আভা নিয়েছে। সপ্ সপ্ আওয়াজ তুলে ছাতায় বৃথা নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে পাশ দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে যায় একজন। তারপর রাস্তায় আবার নির্জনতা ছড়িয়ে পড়ে। অমিতাভর মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

আপনার নামটা বললেন না ত?

আমার নাম অমিতাভ চৌধুরী। নিবাস আগেই বলেছি। কর্মের কথায় বলতে পারি—কষ্ট একাউন্টেন্সী পাশ করার চেষ্টায় আছি। জানি না পাশ করব কিনা। বাড়ীতে বাবা মা আর এক দাদা আছেন, আর একটি বৌদি।

অমিতাভ লঘুস্বরে মন্ত্রপাঠের মত গড়গড় করে বলে যায়।

বাড়ীর ছোট আপনি?

হ্যাঁ।

তাহলে নিশ্চয়ই খুব আদুরে?

না। মার পরিভাষায় আমি বাঁদুড়ে। ছোটবেলায় প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রহার হজম করেছি।

অমিতাভর ভঙ্গীতে সুরেলা আওয়াজ তুলে হেসে ওঠে পাপিয়া।

কিছুক্ষণ পরে অমিতাভ জিজ্ঞেস করে, আপনি নিশ্চয়ই কলেজে পড়ছেন?

হ্যাঁ। প্রেসিডেন্সীতে। সেকেণ্ড ইয়ার আর্টস। আর নিবাসে ত যাচ্ছেনই।

অমিতাভর আগেকার কথার ভঙ্গীতেই বলে পাপিয়া।

আস্তে আস্তে তারা পেঁছয় সাউদার্ণ প্লেসে। কয়েকখানা বাড়ীর পরে একটা ছোট্ট লন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা বাড়ীর

সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। বাড়ীটার চেহারা দেখে অবস্থা সচ্ছলতার ইঙ্গিতে দেয়।

পাপিয়া বলে, এই আমাদের বাড়ী। আস্থন।

গেট খুলে পাপিয়া ভেতরে পা দেয়। অমিতাভ কিন্তু বাহিরেই দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হল? ভেতরে আস্থন।

অমিতাভ নিঃশব্দে আঙুল তুলে 'বিওয়ার অব ডগ' লেখা ফলকটার দিকে দেখায়।

হাসির ঢেউ তুলে পাপিয়া জানায়, ও, এই জন্যে। ভয় নেই, আস্থন।

ভরসার কথাও ত এটাতে লেখা নেই।

অমিতাভ জানায়।

আগে একটা এ্যালশেসিয়ান ছিল। সেটা মরে গেছে। ওটা সেইজন্যেই করা হয়েছিল। বর্তমানে যেটি আছে, সেটির চিৎকারই সার। স্থতরাং নির্ভয়ে আস্থন।

কিন্তু একটা কথা। বর্তমান ধর্মরাজকেও সামলাবেন।

আপনার এত ভয়!

ভয় নয়। সাবধানতা। দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার অন্যতম পন্থা।

আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। আস্থন, ভরসা ত আমি দিয়েইছি।

পাপিয়ার সাথে লন পেরিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢোকে অমিতাভ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার মুখে সিঁড়ির উপর থেকে কথা ভেসে আসে,

দেখ, একেবারে ভিজে এসেছে।

কি করব। পাপিয়া আদুরে গলায় জানায়।

গাড়ী নিয়ে বেরুলে না কেন?

সস্নেহ ধমকের স্থরে বলেন সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক।

মুখের আদলে অমিতাভ আন্দাজ করে নেয়, এ ব্যক্তিটি পাপিয়ার বাবা। বয়স পঞ্চাশের মত হলেও চেহারা এখনও বলিষ্ঠ রয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে সামান্যই। চোখে লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। মুখে সরল অভিব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায়।

পাপিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে, বা রে, তুমিই ত তখন বললে যে গাড়ী নিয়ে নিজে বেরুবে।

অমিতাভ সিঁড়ির কাছে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উঁনি কে পাপি? ওঁকে উপরে আসতে বল।

পাপিয়াকে ডাকার শব্দ দুটিতে অমিতাভ ভদ্রলোকের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

পাপিয়া রমেন্দ্রবাবুকে বলে, উনি হচ্ছেন অমিতাভ চৌধুরী, আর ইনি আমার বাবা রমেন্দ্রমোহন রায়। জান বাপি, বৃষ্টিতে যে রকমভাবে আটকে গেছিলাম, উনি না থাকলে কি করে যে আসতাম!

সিঁড়ির উপর আলাপপর্ব শেষ হয়। পাপিয়া বলে, কি হল, উপরে আসুন।

হ্যাঁ, এই যাই।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে অমিতাভ। ড্রইংরুমের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে সে। দুজনের সিক্ত দেহ থেকে জলধারা নেমে সিঁড়ির উপর দাগ কেটে নামতে থাকে। ছোট্ট একটা সাদা রঙের কুকুর ছুটে এসে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তার চিকন গলার আওয়াজ তুলে বুঝি অনেক প্রশ্ন করে, অসন্তো জানায়। পাপিয়ার মৃদু ধমকে চুপ করলেও, মাঝে মাঝে ‘ভুক্-ভুক্’ চাপা শব্দ তুলে জোর করে চেপে রাখা কথা জানাতে চায়।

ইতিমধ্যে পাপিয়ার মা এসে দাঁড়ালেন।

রমেন্দ্রবাবু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দেখ, তোমার মেয়ের কাণ্ড। কি অবস্থা হয়েছে দেখ। আর মাঝ থেকে এই ভদ্রলোকের মানে অমিতাবাবুর কি দশা করেছে দেখ।

অমিতা নয় বাপি, অমিতাভ—

পাপিয়া সংশোধন করে দেয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অমিতাভবাবু।

না না, এমন কিছুই হয়নি। তাছাড়া, আমার এ অবস্থা না হলে উনি হয় ত আসতে বেশ কষ্ট পেতেন।

অমিতাভ সঙ্কুচিত স্বরে প্রতিবাদ করে।

পাপি, তুমি দারোয়ান বা বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে।

রমেন্দ্রবাবু বলেন।

আমি কি ভেবেছিলাম বৃষ্টিটা এত জোরে নামবে। নইলে ত রিক্সা করে চলে আসতাম।

পাপিয়া অনুযোগ করে।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এবার যাও, কাপড় বদলে এস।

পাপিয়ার মা বলেন।

পাপিয়া অমিতাভর সঙ্গে তার মার আলাপ করিয়ে দেয়। সুষমা দেবীকে সুন্দরীই বলা চলে। গিন্নিবান্নী চেহারার মাঝে লাবণ্যের প্রলেপ। মুখে চোখে শান্তির আর মমতার পরাগ মাখান। মনে শ্রদ্ধা আনে। অমিতাভকে বলেন তিনি, ভিতরে আসুন না।

না, ভিতরে না যাওয়াই ভাল। যে রকম প্রস্রবণ নামছে গা দিয়ে।

অমিতাভ মৃদু হেসে প্রস্তাবটা নাকচ করে দেয়, তারপর এতক্ষণ ধরে থাকা ভিজে কাগজের মোড়কগুলি তাঁর হাতে দেয়।

ছোট্ট হাসির সুন্দর আওয়াজ তুলে সকৌতুকে বলে পাপিয়া, নিখরচায় ধোয়া হয়ে গেল।

পাপিয়া, বাহাদুরকে ডাক। এগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে এখুনি।

সুষমা দেবী বলেন।

বাহাদুর।

পাপিয়া সেখানে দাঁড়িয়েই ডাকে।

বাহাদুর আসে। সুষমা দেবী মোড়কগুলি তাকে দিয়ে বুঝিয়ে বলে দেন, কি করতে হবে।

পাপি, অমিতাবাবুকে এতক্ষণ এমনি ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি ?

রমেন্দ্রবাবু অমিতাভকে নির্দেশ করে বলেন।

অমিতা নয় বাপি, অমিতাভ।

পাপিয়ার আবার সংশোধনে অমিতাভ হাসে।

রমেন্দ্রবাবু যেন সলজ্জে সংশোধন করে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ, অমিতাভবাবু। যাও, কাপড় জামা ছাড়, আর আমার শুকনো কাপড় পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। উনি সেটা পড়ে বসুন, চা-টা খান। তারপর গাড়ী করে ওনাকে পৌছে দেব।

সেই ভাল। আঃ, পাপিয়া তাড়াতাড়ি নাও। নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে তোমার। আর অমিতাভবাবুকেও—

—আজ থাক। এখন আর বসব না, আরেকদিন আসব।

অমিতাভ বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

সে কি! তা হয় না কি! আপনি এতটা কষ্ট করলেন আর একটু না বসেই চলে যাবেন।

সুষমা দেবী প্রতিবাদ করে ওঠেন।

বসুন না।

পাপিয়াও অনুরোধ জানায়।

আরেকদিন আসব, কথা দিচ্ছি। আজ, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ীর পৌছান আমারও উচিত।

আরেকদিন তাহলে ঠিক কিন্তু আসা চাই।

সুষমা দেবী বলেন।

হ্যাঁ আসব।

চলুন গাড়ীতে আপনাকে পৌছে দি

রমেন্দ্রবাবু বলেন।

অমিতাভ স্মিত হেসে বলে, গাড়ীতে এ অবস্থায় উঠলে, সিটের আর কিছু থাকবে না। আর রাস্তায়ও বেশ জল জমেছে। গাড়ী যদি কোথাও আটকে যায়, তাহলে আরো খারাপ। একবার ভিজেইছি যখন, তখন আর অসুবিধা হবে না। আচ্ছা—

নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে অমিতাভ। ভিজে কাপড়ের আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, পাপিয়া সিঁড়ির কিছুটা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি হল আবার?

অমিতাভ মৃদু হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে।

—ঠিক আসবেন কিন্তু, ভুলবেন না?

যেন এ কথাটুকু মনে করিয়ে দিতেই পাপিয়া এসেছিল।

ওর মিষ্টি মুখের টলটলে চোখ দুটির দিকে চেয়ে অমিতাভ বলে, না, ভুলব না।

আবার বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ে অমিতাভ। মনটা অজানা কারণে কোন এক পুলকে অবগাহন করেছে যেন। মুখটা আকাশের দিকে পেতে বৃষ্টির জলটা সোজাসুজি মুখে নেয় অমিতাভ। চনমন করে প্রাণটা। অকথিত কোন কথা বুঝি তোলপাড় করে, ক্ষণে ক্ষণে, মনে মনে। বৃষ্টির জলটা হাত পেতে ধরতে চেষ্টা করে সে। একলা নির্জন রাস্তায় বাড়ীর পথে পাড়ি দিতে দিতে ভাবতে চেষ্টা করে আজকের রাতের ঘটনাটা—যেন···

গুণগুণিয়ে গাইতে গাইতে এগোতে থাকে—

রবি ঠাকুরের একটা গান:

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।···

সেই বৃষ্টিঝরা রাতের পর দিন চারেক কেটেছে। পাপিয়াদের বাড়ী কথা দিয়ে আসা সত্ত্বেও সেদিনের পর যাওয়া আর হয়নি বা যেতে পারেনি। ইচ্ছে যে ছিল না, এমনও নয়। কিন্তু 'কিন্তুর' নাগপাশে জড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে অমিতাভ। ভেবেছে কত কি যে তার ঠিকানা নেই।

অমিতাভর রোজকার হেঁটে যাওয়ার পথেই পড়ে 'সুদক্ষিণা' বই-এর দোকান। সন্ধ্যার সময় সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছিল অমিতাভ বই সাজান লম্বা র‍্যাকটার সামনে।

মহালয়ার দিন। দোকানে ভীড়ের ঘনত্ব বুঝি সেই কারণে বেড়েছে। দোকানের লোকেদের ব্যস্ততাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। নতুন বইও কিছু সাজান রয়েছে। দেখেশুনে একটা বই কেনে অমিতাভ। বাড়ীর সকলের—অর্থাৎ মা, বাবা, দাদা, বৌদিব পূজা পালন হচ্ছে এবার ভ্রমণে। একলা মানুষের এই সময়টা ভারী হয়ে ওঠে। তখন বই আর আড্ডা একমাত্র উপাদেয় বস্তু।

বই-এর দামটা দিয়ে ভীড়ের মাঝ থেকে বেড়িয়ে আসে অমিতাভ। গরমও পড়েছে বেশ আবার বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে?

এই। এই অমিতাভবাবু।

সম্বোধনের উৎপত্তিস্থল খুঁজতে ঘুরে দাঁড়ায় অমিতাভ।

পাপিয়া। সঙ্গে রমেন্দ্রবাবু আর সুষমা দেবী। আসমানী রঙের সাড়ী পড়া পাপিয়াকে দোকানের উজ্জ্বল আলোয় যেন আরো ভালো লাগে। ওরাও বোধহয় বই কিনতে এসেছে। কাছে এগিয়ে যায় অমিতাভ।

খুব গেলেন ত আমাদের বাড়ী? বাব্বাঃ, একদম কথার ঠিক নেই। অভিমানের স্বরে অনুযোগ মিশিয়ে বলে পাপিয়া।

মানে, একটু কাজ পড়ে গেছিল। সেইজন্যে ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি।

কারণ হিসেবে নিজের এক অজানা কাজকে খাড়া করে অমিতাভ।

জানি,। এমন কথাই বলবেন। কি এমন কাজ ছিল যে এক মিনিটের জন্যেও সময় করে যেতে পারলেন না?

ছিটকে আসা কপালের উপরকার চুলের গোছাটা সরাতে সরাতে বলে পাপিয়া।

ভুরুর উপর কাটা দাগটা নজরে আসে অমিতাভর। ওটা যেন পাপিয়ার সুন্দরতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটবেলাকার কোন দুষ্টুমির চিহ্ন বোধহয়।

এক মিনিটের জন্যে ত যাওয়ার কথা ছিল না। অন্ততঃ চা খাওয়ার সময়টুকু ত চাই। কিন্তু সেটুকু সময় পেলে তবে ত যাব।

অমিতাভ হাসতে হাসতে বলে।

সেইটুকু সময়ও প :নি। এমন মিথ্যা কথা বলবেন না। এমন রাগ হচ্ছে আমার, যে—

মুখ দেখতে ইচ্ছে কবছে না। তাহলে যাই কি করে।

অমিতাভ কথা কেড়ে নিয়ে যেন শেষ করে দেয় পাপিয়ার হয়ে।

হুঁঃ।

রমেন্দ্রবাবু এবার বলে ওঠেন, আমরা আপনাকে খুব এক্সপেক্ট করছিলাম। পাপির মা ত প্রায়ই রোজ বলেন, কই অমিতাভবাবু ত এলেন না। এত কষ্ট করলেন সেই রাত্রে।

আপনার আসা উচিত ছিল একদিন।

সুষমা দেবী বলেন।

আমার কথা না রাখতে পারার জন্যে সত্যি আমি লজ্জিত বোধ করছি।

অমিতাভ বলে।

কাজ না থাকে ত আজ চলুন। পাপিয়ার এক কাকাও এসেছেন। বেশ সময়টা কাটবে।

সুষমা দেবী বলেন।

হ্যাঁ, শুভেন ত খুব আমুদে লোক। আপনি থাকলে আমরা আরো বেশী আনন্দ পাব। রমেন্দ্রবাবু সায় দিয়ে বলে ওঠেন।

হয়ত কোন কাজ আছে। আজ যাওয়াই হবে না। যেন হাওয়াকে লক্ষ্য করে কথা বলে পাপিয়া।

অমিতাভ তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। তারপর সুষমা দেবীর দিকে চেয়ে বলে, না, আজ হাতে একটু সময় আছে। চলুন, আজই যাব।

তাই বুঝি বলার আগে যাননি? ভ্রূ কুঁচকে পাপিয়া প্রশ্ন করে।

গেলে ত বাড়ীতে পেতাম না।

তবুও না হয় যেতেন।

আর কথা নয়। আর কথা নয়। রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন। তারপর বলেন, তোমাদের বই কেনার পর্বটা সেরে নাও তাড়াতাড়ি, তারপর বাড়ীর দিকে চল।

—হ্যাঁ। পাপিয়া, নানুর জন্যে দুটো ছোটদের পূজাবার্ষিকী নিয়ে নাও। সুষমা দেবী বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রমেন্দ্রবাবুও বলে উঠেন, আর শোন, দু'একটা ডিটেকটিভ-টিটেকটিভ বইও বেছে নিস পাপি।

হ্যাঁ, তুমি পড়বে সেগুলো।

রমেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন সুষমা দেবী। তারপর হেসে অমিতাভকে বলেন, জানেন, নানুর সব বই উনি আগে শেষ করবেন। বিশেষ করে ঐ ডিটেকটিভ। তারপর পকেট বই ত আছেই।

কে? আমি—?

রমেন্দ্রবাবু তাঁর দোষ খণ্ডাতে লেগে যান—দূর, আমার ওসব বই-ফই ভালো লাগে না। নানু পছন্দ করে, তাই বলছিলাম। ছেলেমেয়েগুলো ওতে যে কি আনন্দ পায়, ওরাই জানে।

বাপি, সেদিন খবরের কাগজ দিয়ে আড়াল করে 'অভিশপ্ত চন্দ্রহার' কে পড়ছিল?

পাপিয়া হাসতে হাসতে রমেন্দ্রবাবুর লুকিয়ে রহস্য-রোমাঞ্চ বই পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অমিতাভ আর সুষমা দেবী হেসে ওঠেন। একা কোণঠাশা হয়ে রমেন্দ্রবাবু যেন অসহায় বোধ করেন। বলেন—আমি—

জোর করে অভিযোগ খণ্ডাতে চান রমেন্দ্রবাবু। তারপর পাপিয়াকে বলে ওঠেন—নে, নে, তাড়াতাড়ি কর।

পাপিয়ার বই কেনা শেষ হয়। দোকানের সামনে গাড়ীটা রাখা ছিল। অমিতাভ পাপিয়াদের সঙ্গে তাদের বাড়ীর পথে রওনা হয়। খুশীর মেজাজে যেন সকলে গাড়ীতে বসে থাকেন। ছোটখাট হাসির কথাবার্তা। পাপিয়ার চকিত চাউনি অমিতাভর মনে এনে দেয় আবেশ। গাড়ী এসে পেঁছিয় সাউদার্ণ প্লেসের সেই বাড়ীটায়।

উপরে উঠে ড্রইংরুমের মধ্যে এসে দাঁড়ায় তারা। রমেন্দ্রবাবু অমিতাভকে বলেন—বসুন অমিতাভবাবু।

তাদের আসার সোরগোলে ছুটে আসে বছর সাতেক বয়সের একটি ছেলে। কোন দিকে না তাকিয়ে সুষমা দেবীর হাত ধরে বলে ওঠে—মা, আমার বই এনেছ?

তার সঙ্গে দৌড়ে আসা সেই ছোট্ট কুকুরটা অমিতাভকে দেখে তার চীকন গলায় অপরিচিত মানুষের ঘোষণা করছিল।

পাপিয়া ধমক দিয়ে বলে ওঠে—এই চুপ কর। চিনতে পারছিস না।

কিন্তু আবার ডাক শুরু করতেই, পাপিয়া ধমক দেয়। গুটিগুটি এগিয়ে এসে অমিতাভ পরিচিত করে নেয় ওকে।

ছেলেটি সুষমা দেবীকে আবার বলে—

কই মা, আমার বই কই ?

পাপিয়া বলে—আনা হয়েছে রে, আনা হয়েছে। চারটে বই, নে ধর।

প্যাকেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটির মাথার চুল নেড়ে দিয়ে অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে পাপিয়া বলে—এই হচ্ছে আমাদের নান্নুবাবু। আমার ভাই।

নান্নু মৃদু হাসির রেখা মুখে নিয়ে সলজ্জ চোখে অমিতাভর দিকে একবার চায়। তারপর বই পাওয়ার আগ্রহে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ভেতর দিকে চলে যায়।

আরে আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন! বসুন, বসুন।

রমেন্দ্রবাবু বলে ওঠেন।

আপনি আর আমাকে আপনি বলছেন কেন? তুমিই বলুন না।

অমিতাভ বসতে বসতে রমেন্দ্রবাবুকে বলে।

ঠিক। ঠিক। তাহলে তুমিই বলা যাক আপনাকে। কি বলেন ?

রমেন্দ্রবাবু সমর্থন করেন অমিতাভর কথা সেই 'আপনি'কে আঁকড়ে ধরে।

এটা কি রকম কথা হল বাপি। 'তুমিই বলা যাক আপনাকে, কি বলেন।' তুমি বললে কোথায় ?

পাপিয়া রমেন্দ্রবাবুকে বলে ওঠে।

এ্যাঁ, ঠিক ঠিক। যাক গে—চা কই—চা।

রমেন্দ্রবাবু হাঁক পাড়েন।

—একটু বস। তোমাদের চা পাঠাচ্ছি।

—ফরগেট মি নট্।

কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে বলতে বলতে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বছর বয়স হবে। পরনে পাঞ্জাবী আর পায়জামা। রগের দুপাশে চুল পেকে গেছে। মাথার উপরকার চুলগুলি পাতলা হয়ে এসেছে। মুখটি ঠাট্টায় যেন উন্মুখ। রোদে পুড়ে রঙ তামাটে হয়েছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। হাতে একটা ফুল।

সুষমা দেবী হেসে তাঁকে বলেন—না, তোমাকে না ভুলেই বলেছি।

তোমরা খাবে ত ?

না।

থাকগে, না খেলে।

সুষমা দেবী হেসে বেড়িয়ে যান। ভদ্রলোক পাপিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন—এই নে কাউয়া 'ফরগেট মি নট'। আমার শ্রীহস্তের উদ্যান কুশলতার ফলস্বরূপ এই ফুল। শম্ভুকে ফোন করতে, ও দিয়ে গেল। কারণ, আসার সময় আমি ফরগেট করেছিলাম। বেশ নামটা, ফরগেট মি নট। বৌদিকে চা, আর ফুলের নাম, দুটোই বলা হয়ে গেল। ধর না রে কাউয়া ফুলগুলো।

চিনিকাকু, তুমি ফের আমাকে কাউয়া বলে ডাকছ।

পাপিয়া অভিমানাহত স্বরে বলে।

সরি! উইথ ড্র, উইথ ড্র। বুঝলি, নামে কি এসে যায়। যেমন তোকে পাপিয়া না বলে কাউয়া বলে ডাকলে, ওটাই ত এক্সপেরিমেণ্ট। বুঝলি কি না ?

থাক, অনেক হয়েছে। এস, আলাপ করিয়ে দি। ইনি অমিতাভ চৌধুরী। আর তখন যার কথা হচ্ছিল, ইনি সেই চিনিকাকু, মানে শুভেন রায়।

আলাপের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয় পাপিয়ার মাধ্যমে। শুভেন বাবু যেন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে বলে ওঠেন, ও হোঃ, তাহলে আপনিই সেই রোমাণ্টিক নাইটের রোমাণ্টিক ব্যক্তিটি। বেশ, বেশ।

পাপিয়া ত বলতে গেলে সেই রাতের পর যে কবার টেলিফোন করেছি সে কবারই...

চিনিকাকু।

সলজ্জ প্রতিবাদে শুভেনবাবুর কথায় বাধা দিয়ে ওঠে পাপিয়া।

ষ্টপ।

শুভেনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, কোন এক পক্ষের আপত্তিতে ও প্রসঙ্গ মুলতুবী রইল। পরে এক সময়ে বলা যাবে।

আবার পরে।

না। পরেও বলা যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মত আউড়ে ওঠেন শুভেনবাবু।

অমিতাভ হাসতে হাসতে বলে—টেলিফোনে নিশ্চয়ই বদনাম করছিলেন উনি।

আমার বলা বারণ। আমি কি বলছি—

পাপিয়াকে আবার বাধা দিতে উদ্যত দেখে বলে ওঠেন তিনি, না না, বলব না।

অমিতাভ হেসে ওঠে শুভেনবাবুর ভঙ্গীমায়। কথাবার্তা আস্তে আস্তে বেশ জমে ওঠে। রমেন্দ্রবাবুও যোগ দেন তাদের মাঝে। ড্রইংরুম মশগুল হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই। কথার প্রসঙ্গে প্রথম আলাপেই শুভেনবাবু নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। রমেন্দ্রবাবু আরও কিছু যোগ করে দেন।

জানা যায়, শুভেনবাবু রমেন্দ্রবাবুর খুড়তুতো ভাই। লেদের ছোটখাটো একটি কারখানা আছে। বর্তমানে সেখান থেকে ভালই আয় করেন তিনি। বিয়ে এখনও করেন নি। বাড়ী করেছেন বাগবাজারের উপকণ্ঠে। প্রথম জীবনে তাঁর কর্মব্যস্ততা শুরু হয় যখন, তখন তাঁর বয়স আঠার কি উনিশ। পৈতৃক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তবু স্নেহপ্রবণ রমেন্দ্রবাবুর উপযাচক হয়ে দেওয়া সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অস্বীকার করে জীবন সংগ্রামে অস্তিত্বের

প্রমাণ তিনি রেখেছেন এবং সেটি নিজের ক্ষমতার বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিয়ে না করার সেটিও একটি কারণ। নিজের এক বড় বিধবা বোন আর তাঁর ছেলের দেখাশুনা করেন। পাপিটাকে স্নেহ করেন এবং ভালোওবাসেন ভীষণ। রমেন্দ্রবাবুর প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। কথা প্রসঙ্গে শুভেনবাবু তাই বলছিলেন, দেখুন ভাই, জীবনে অনেক লড়েছি। বহু লোকের সম্পর্কে আমাকে আসতে হয়েছে। অনেক কিছু দেখেছি। এই দেখুন না কেন, সেদিন আমার সঙ্গে—না, থাক ওসব কথা। বেশ আছি। কাউয়াটাকে না দেখে থাকতে পারি না। ওই আমায় মায়ায় আবদ্ধ করেছে। নইলে সংসারের টান আমার তেমন নেই।

এরই মধ্যে বাহাদুর টেবিলে কিছু খাবার আর চা দিয়ে গেছিল। পাপিয়া সকলকে চা তৈরী করে দিতে থাকে।

শুভেনবাবু পাপিয়ার হাত থেকে চা নিয়ে বললে—আচ্ছা কাউয়া, এ তোর কি রকম ব্যবহার ? কতদিন বললাম, চল, আমার বাড়ী গিয়ে দিন কতক থাকবি। সে কথা একবার কানেও তুললি না।

যাব বলেছি ত। এবার নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু তুমি দুদিন এখানে থাক তার আগে। আদুরে গলায় পাপিয়া বলে।

আর গেছিস। আমার মরা'র দিন বোধ হয় যাবি ?

শুভেনবাবু হাসতে হাসতে বলেন।

এমন সব কথা বল না কাকু। রাগ হয় ভীষণ।

পাপিয়া গম্ভীর হয়ে বলে ওঠে।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কবে যাবি ? সব ব্যবস্থা করতে হবে ত। নইলে চিনিকাকুর উপর রাগ হবে যে।

পরে বলব।

আচ্ছা। তারপর, হিরো অব দি রেইনি নাইট, আপনি কিছু বলছেন না যে। আমি ত এতক্ষণ একা একা বকবক করে গেলাম।

অমিতাভ মৃদু হেসে জানায়, শুনছি। বেশ লাগছে। কিছু বলে সেটার আস্বাদ নষ্ট করতে চাইছিলাম না।

গুড লিসনার। তার দায়িত্ব অনেক।

রমেন্দ্রবাবু এবার বললেন।

আচ্ছা, আচ্ছা—বলে শুভেনবাবু হাসতে থাকেন। হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে যান। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বলেন, এস বিকাশ, ভেতরে এস। ভদ্রলোকের বাড়ীতে কেউ ওরকম উঁকিঝুঁকি মারে না।

অমিতাভ হঠাৎ শুভেনবাবুর কথাবার্তার আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে একজন যুবক। তার থেকে কিছু বড়ই হবে বয়সে। মুখে কৃতার্থতা জ্ঞাপক হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে অমিতাভ। সারা দেহে মুখে অন্যায় অত্যাচারের চিহ্ন প্রকট। হলদেটে চোখ। তামাটে রঙ মুখে লেপটে লোকটাকে অদ্ভূত দেখাচ্ছে। কোথায় যেন একটা শঠতা লুকিয়ে রয়েছে মানুষটার মাঝে। ঘরে ঢুকে ময়লা কলঙ্কিত দাঁতগুলি হাসির আওতায় মেলে ধরে।

আরে বিকাশ, এস এস। কতদিন বাদে এলে বল ত। একযুগ মনে হচ্ছে। রমেন্দ্রবাবু অভ্যর্থনা জানান।

শুভেনবাবু গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন, তারপর কি মনে করে?

না, এই আর কি যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। আপনার কাছেই শুনেছিলাম, আপনি এখানে থাকবেন। তাই চলে এলাম।

মুখের সেই হাসিটি লেগেই থাকে। অস্বস্তি এসে যেন ভীড় করে ঘরটিতে।

ও। শুভেনবাবু ছোট্ট জবাব দেন নিস্পৃহ কণ্ঠে।

রমেন্দ্রবাবু যেন সবকিছু সামলাতে ব্যস্ত হয়ে বলেন, বোস হে বোস। পাপি, যাও, আরেক কাপ করে চা সকলের জন্যে পাঠাতে বলে এস।

পাপিয়া যেন অসন্তুষ্ট মনে উঠে ভেতরে চলে যায়।

পাপিয়া ত বেশ বড় হয়ে গেছে বড় মামা। কতদিন বাদে দেখলাম ওকে।

রমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে বিকাশ।

বয়স হচ্ছে, বড় হবেই। থাক, আসল ব্যাপারটা কি তাই বল ?

শুভেনবাবু কোন ভনিতাতে যেন নারাজ।

মানে এমনিই···

না, না। কোন কারণ ছাড়া তুমি আমার শ্রীমুখ দর্শনাভিলাসী, সেটা ভাবাই যায় না। যাক, আমাকে না দেখে তোমার প্রাণ কাঁদছিল জেনে আশ্বস্ত হলাম।

শুভেনবাবু কঠোর কণ্ঠে ব্যঙ্গ করেন।

মামা—মানে—একটু—

বিকাশ থেমে যায়।

বল, কি বলবে ?

ঘরের হাল্কা বাতাসটা বিদায় নিয়েছে, সেটা অনুভব করে অমিতাভ। বিকাশের আগমনই যে সেটার জন্যে দায়ী, সেটুকু সে বুঝতে পারে।

বিকাশ একবার শুভেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তারপর বলে, বলব এখানে ? মানে—একজন অপরিচিত লোক রয়েছে।

বাঃ, সে সেন্সটুকু আছে দেখছি।

তীক্ষ্ণ জিহ্বাধারায় আঘাত করতে চান শুভেনবাবু।

আমি তাহলে—

অমিতাভ বিদায় চায় তার অপ্রয়োজনীয়তা বুঝে।

না, না, আপনি বসুন।

শুভেনবাবু বলে ওঠেন। তারপর বিকাশের দিকে চেয়ে বলেন, ইনি হচ্ছেন অমিতাভবাবু। আর এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে বিকাশ ঘোষ। এবার বল।

মানে—বড়মামার সামনে হলেও হত, কিন্তু এনাকে ত ভালো করে চিনি না।

আবার কুণ্ঠা প্রকাশ করে বিকাশ।

চেন না বলেই ত আলাপ করিয়ে দিলাম। থাকগে, কিছু বলার না থাকে ত যেতে পার। ডোণ্ট স্পয়েল মাই টাইম।

শুভেনবাবু কঠোর কণ্ঠে কাটা কাটা ভাবে বলেন বিকাশের উদ্দেশ্যে।

আহা, অসুবিধা থাকে ত, তুই বাইরে গিয়ে একটু শুনেই আয় না। জোর করার দরকার কি?

না, যা বলার এখানেই বলতে হবে। কি তার এমন দরকার যে, এখানে পর্য্যন্ত সে ধাওয়া করে। না, যা বলবার এখানেই বলতে হবে।

শুভেনবাবুর ক্ষোভিত গলায় জিদের পর্দা নেমে আসে।

আহা—

আবার বিকাশের স্বপক্ষে কথা বলতে চেষ্টা করেন রমেন্দ্রবাবু। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শুভেনবাবু বললেন, না না দাদা, এই ভাগ্নে রত্নটি আমার জীবনটা নরক করে তুলেছে। অল রাইট, তুমি কিছু না বললেও তোমার কথা কি হবে জানি। সো, ইন এনি কাইণ্ড অব মানি ম্যাটার্স অব ইয়োর্স, মাই এন্সার ইজ নো।

মামা, মানে আপনি আমার প্রেস্টিজ—

বিকাশের কথায় বাধা দিয়ে শুভেনবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন আবার, প্রেস্টিজ্ যাচ্ছে তোমার। সেটা তোমার মত লোকের নেই বলেই ত জানি। তোমার প্রেস্টিজ অনেক বাঁচিয়েছি, আর নয়। এ রকম একটা ওয়ার্থলেস লোকের পেছনে টাকা ঢালতে আমি রাজী নই।

মামা, আমাকে অপমান করবেন না। আপনি কটা টাকা দিয়ে—

বিকাশের গলা ঘন হয়ে আসে।

তোমার মত লোফার ক্লাসের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। নাউ ইফ ইট হ্যাভ এনিথিঙ এলস টু টেল মি—আর বলার না থাকে গেট আউট।

আপনি কি আমায় ভিক্ষা দেন? আমি জানি—থাক, বেশী কিছু বলব না। আপনার প্রেস্টিজ্ আমি রাখলাম।

বিকাশ ক্রুর চোখে চেয়ে বলে।

গেট আউট, গেট আউট আই সে।

শুভেনবাবু উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠেন।

আঃ শুভেন, কি করছিস।

রমেন্দ্রবাবু শুভেনবাবুকে থামাতে ব্যস্ত হন।

বিকাশ রেগে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়।

অমিতাভ নির্বাক হয়ে এই অস্বস্তিকর কথাবার্তার মাঝে বসেছিল। পরে অবশ্য সে পাপিয়ার কাছে শুনেছিল, এই বিকাশ এক কথায় শুভেনবাবুর গুণধর ভাগ্নে। সব রকম বদ নেশাই সে মামার পয়সায় চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে ক্ষেপে যান শুভেনবাবু।

রমেন্দ্রবাবু শুভেনবাবুকে বলেন—এ রকম এক্সাইটেড হয়ে যাস কেন? যখন ফেলে দিতে পারবি না, তখন একটু সহ্য করতেই হবে।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে দাদা। আজ বছর এগার বারো বসে থেকে থেকে শুধু ওয়ার্থলেস নয়, একটা ক্রিমিনাল গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর জন্যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আজকাল উনি আবার—থাক, সে কথা বললে আমাকেই লজ্জা পেতে হবে।

সুদীর্ঘ একটি শ্বাস ছেড়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শুভেনবাবু অমিতাভকে বলেন, কিছু মনে করবেন না অমিতাভবাবু।

না, না, আমার মনে করার কথাই নয়।

সুষমা দেবী পাপিয়াকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, কি

ব্যাপার শুভেন। রেগে গেছিলে কেন বিকাশের উপর। তোমার চড়া গলা শুনে পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করতে বললে বিকাশ এসেছে। যাক, ভাগ্য ভাল খুনোখুনি কর নি।

হ্যাঁ, ওটাই বাকি আছে।

শুভেনবাবু জবাব দেন।

ঘরের সেই মেজাজী সুরটা কেটে যাওয়াতে অমিতাভর বিস্বাদ লাগে মনটা। সে বলে, আচ্ছা, আমি তবে আজ যাই।

, সে কি! আমি এলাম একটু কথাবার্তা বলতে। এর আগে ত ভাল করে কথাই হয় নি। তাছাড়া এখন গেলে কি করে হবে। রাতে এখানে খেয়ে যেতে হবে।

সুষমা দেবী বলেন।

ওরে বাবা। আজ নয়। আরেক দিন হাতে নিয়ে আসব। তখন খাওয়া, গল্প সব হবে। আজ উঠি।

ঠিক আসবে ত। এই দেখ, আবার তুমি বলে ফেললাম।

সুষমা দেবী হেসে সলজ্জ কণ্ঠে বলেন।

ভালোই করলেন।

অমিতাভ স্মিত হেসে বলে।

ঠিক আছে। ভালোই হল। ঠিক আসবে কিন্তু। নইলে রাগ করব।

নিশ্চয়ই আসব।

আবার ধরে আনার মত 'নিশ্চয়ই' নয় ত?

ঘাড় বেঁকিয়ে পাপিয়া জিজ্ঞেস করে।

দেখবেন, এবার আর ধরে আনতে হবে না।

অমিতাভ তার দিকে চেয়ে বলে।

পাপি, ড্রাইভারকে বল গাড়ীটা নিয়ে অমিতাভবাবুকে পেঁাছে দিয়ে আসুক।

রমেন্দ্রবাবু বললেন।

না, না, তার দরকার হবে না। তাছাড়া আমি এক বন্ধুর বাড়ী যাব।

অমিতাভ জানায়।

সেইখানেই না হয় পেঁৗছে দেবে।

পাপিয়া বলে ওঠে।

না থাক। আজ চলি।

বলে উঠে দাঁড়ায় অমিতাভ। শুভেনবাবুর উদ্দেশ্যে বলে, চলি চিনিকাকু।

আচ্ছা ভাই। আমারও কথা বলা হল না আজকে। যাক, আর একদিন কাউয়ার সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাবেন। নেমন্তন্ন রইল।

শুভেনবাবু স্মিত হেসে অমিতাভকে বলেন।

যাব।

ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে অমিতাভ। পাপিয়াও তার সঙ্গে সঙ্গে আসে সিঁড়ি পয্যন্ত।

কবে আসবেন আবার ?

পাপিয়া প্রশ্ন করে।

দেখি।

আচ্ছা, আড্ডাটা কি একদিন এখানে জমালে হয় না।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রস্তাব জানায় পাপিয়া।

সেই জন্যেই ত আসব। বলা যায় না, হয়ত কালই আসতে পারি। আর এরপর এত ঘন ঘন আসব যে, শেষে আপনারাই বিরক্ত হবেন হয়ত।

মোটেই না। রোজই আসুন না।

আচ্ছা, আপনাদের টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। নাম্বারটা দিন। আসার আগে ফোন করে আসব।

অমিতাভ পাপিয়ার মুখের দিকে চায়।

তাহলে ত ভালই হয় মশায়। প্লিজ এক মিনিট। আমি লিখে আনছি।

পাপিয়া দৌড়ে ঘরের ভিতর চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত বাদে ফিরে এসে পেনের ক্যাপটা লাগাতে লাগাতে নাম্বার লেখা চিরকূটটা অমিতাভর হাতে দিয়ে পাতলা ঠোঁটে হাসি টেনে বলে, হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

হারাবে না। অমিতাভ মনে মনে ভাবে। মুখে কিছু বলে না সে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দুজনে অকারণ দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির মাথায়। অমিতাভ হঠাৎ বলে, আমার নাম্বারটা লিখে নিন। দরকার হলে আমাকেও ফোন করতে পারেন।

বলুন।

হাতের তালুতে লিখে নেবার জন্য প্রস্তুত হয় পাপিয়া।

নাম্বারটি বলে অমিতাভ। পাপিয়া লিখে নেয় আস্তে আস্তে। অমিতাভ মৃদু হেসে বলে, মুছে ফেলবেন না যেন।

পাপিয়া জবাব দেয় না। চকিতে চোখ দুটি তুলে নামিয়ে নেয় সে। ঠোঁটে ফুটে ওঠে আবার ছোট্ট হাসি।

আজ আসি তাহলে।

গুডনাইট।

গুডনাইট।

অমিতাভও জানায়। শুভেচ্ছার আদান প্রদান সেরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে অমিতাভ। সামনের লনটুকু পেড়িয়ে গেট দিয়ে বেরুতে গিয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চায় একবার। দেখে পাপিয়া সেখানে তখনও দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলতে সুরু করে অমিতাভ।

পাপিয়া। কি মিষ্টি নাম। মিষ্টি বুঝি তার সবকিছু।

বরষা...

...সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। অথচ মনে হয় সন্ধ্যার শেষ পদক্ষেপ রাত্রির দরজায় এখন। মেঘলা দিনের এই বিভ্রান্তি। মেঘে মেঘে শুধু বেলাই হয় না, ভুলও বোঝায়। আবার নেমেছে সেই বৃষ্টি। বর্ষাকালের মত দুদিন ধরে চলেছে অপরিশ্রান্ত ঝিরঝির বর্ষণ। অসহ্য। এই টিপ টিপ করে ঝড়ে পরা জল মনে অস্থিরতা জাগায়...না ভালো লাগে বেরুতে—না ভালো লাগে ঘরে বসে থাকতে। অশান্তিকর অবস্থা। অমিতাভর বহির্মুখী মনটা ছটফট করতে থাকে। নিরুপায় হ'য়ে চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার উপর পা তুলে বসে থাকে অমিতাভ ঝিরঝিরে বৃষ্টিটার দিকে চেয়ে।

পাপিয়াদের বাড়ী গত তিনদিন রোজই গেছে সে। পাপিয়া বলেছে, আজকে সে চিনিকাকুর বাড়ীতে থাকবে। কারণ, চিনিকাকু বড়ই পীড়াপীড়ি করছেন। সময় গুলো বেশ কোন এক আবেশে যেন কেটে গেছে অমিতাভব। এ ক'দিনের পরিচয়ে পাপিয়াদের সঙ্গে যেন বেশ কাছাকাছি হয়ে উঠেছে সম্পর্কটা।

বিরক্ত হয়ে শেষ পয্যন্ত অমিতাভ ভাবে, ওয়াটার প্রুফটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়বে। ভালো লাগছে না এ ভাবে বসে থাকতে।

এমন সময় বাড়ীর চাকর নিরাপদ ঘরে এসে ঢোকে। তার দিকে প্রশ্ন করা চোখে চাইতে সে বলে, ছোটবাবু, তোমাকে এক বন্ধু ডাকছেন।

কে, অজিত?

বৃষ্টিতে যার আসা সম্ভব, সেই বন্ধুটির নাম করে অমিতাভ।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিবারণ বলে, চিনতে পারলুম না। তবে এর আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি যা।

নিবারণ বেড়িয়ে যেতে, অমিতাভ তাদের বসবার ঘরটার দিকে এগোয়।

ঘরে ঢুকতেই দেখে, তাদের কলেজ জীবনের বন্ধু সুপ্রিয় বসে আছে। সেকেণ্ড ইয়ার থেকে অবশ্য সুপ্রিয়র সঙ্গে অমিতাভর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেই সুপ্রিয়—শান্ত, শিষ্ট সুপ্রিয়। অমিতাভ শুনেছিল, ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করে সুপ্রিয় পড়া ছেড়ে দিয়ে পোলট্রি খুলেছিল। আর যেন কিসের ব্যবসাও করেছিল তার সঙ্গে। যদিও ষ্টুডেণ্ট হিসেবে সে ভালোই ছিল।

বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে অমিতাভ, সুপ্রিয়, তুই হঠাৎ যে? কেমন আছিস?

ভাল। এদিকে কাজে এসেছিলাম। সময় থাকাতে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। এমনিতে ত দেখা হয় না।

মৃদু হাসি নিয়ে আস্তে আস্তে বলে সুপ্রিয়।

বেশ করেছিস। কতদিন বাদে দেখা হ'ল বল ত! তোর খবর কি বল? আচ্ছা, শুনেছিলাম তুই নাকি একটা পোলট্রি করেছিস।

জামার পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা নিজের জন্য নিয়ে প্যাকেটটা সুপ্রিয়র দিকে এগিয়ে ধরে বসতে বসতে বলে অমিতাভ।

হ্যাঁ।

সিগারেট নিয়ে দেশলাইএ নিজের এবং অমিতাভর সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে সুপ্রিয়।

হাওড়া আমতা লাইনে ছোট্ট একটা জমি কিনে ছোট্ট করে···

অমিতাভ প্রশ্ন করে।

মন্দ নয়। তবে আবার খুব ভালোও নয়।

কেন? শুনেছি পোলট্রি বিজনেস ত বেশ প্রকিটেবল?

অমিতাভ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। প্রাফিটেবল

হ্যাঁ ভালোই। তবে অন্য ছোটখাট বিজনেস দেখে ও দিকটায়

সময় কম দিতে পারি। উপরন্তু অসুখ-বিসুখ লেগে গেলে নরক শুরু হয়ে যায়।

সিগ্রেটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলে সুপ্রিয়।

চা বলি। তারপর জমিয়ে বসা যাবে। নিবারণ, নিবারণ।

ভিতরের ঘরে টেলিফোন বাজতে শুরু করে। আওয়াজ থামতে অমিতাভ বুঝতে পারে, নিবারণ টেলিফোনটা ধরেছে। অনেকটা স্বগতোক্তিতে বলে,

কে আবার টেলিফোন করল?

কয়েক মুহূর্ত বাদে নিবারণ ঘরে এসে বলে, ছোটদাদাবাবু, তোমার টেলিফোন।

যাচ্ছি। শোন, চা করে দে আমাদের। আর বিস্কুট বা খাবার কিছু থাকলে নিয়ে আয়। আমি আসছিরে সুপ্রিয়।

অমিতাভ ভিতরের ঘরের দিকে যায়।

হ্যালো।

অমিতাভ অপর পক্ষকে তার উপস্থিতি জানায়।

হ্যালো। কে, অমিতাভ?

অপর পক্ষ থেকে সোৎসুক প্রশ্ন ভেসে আসে।

হ্যাঁ।

শোন, আমি রমেন্দ্র রায় বলছি।

হ্যাঁ, বলুন।

মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খায় অমিতাভর। রমেন্দ্রবাবু হঠাৎ? কি ব্যাপার? কিন্তু উনি আমার টেলিফোন নাম্বার জানলেন কি করে?

মনের কথা বুঝতে পেরে রমেন্দ্রবাবু বলেন, শোন, পাপির তোমার নামে নোট করা নাম্বার দেখে টেলিফোন করছি।

কি ব্যাপার বলুন ত?

কি আর বলব। হঠাৎ খবর পেলাম—বুঝতে পারছি না কিছু। কাকে ডাকব ভাবতে গিয়ে তোমাকেই প্রথম মনে পড়ল।

অসংলগ্নভাবে কথাগুলো আউড়ে যান রমেন্দ্রবাবু।

কি হয়েছে?

উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে অমিতাভ।

সাঙ্গাতিক। মানে, এক কাজ কর—হ্যাঁ, তুমি এখানে চলে এস—এখুনি।

মানে—

কি যে করি। তোমার কি কোন অসুবিধা আছে?

না। আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কি ব্যাপার হয়েছে একটু বলুন না, প্লিজ।

জান শুভেন—

হ্যাঁ।

ও, মানে শুভেন—শুভেন মার্ডারড হয়েছে। মানে খুন—

এঁ্যা, শুভেনবাবু—চিনিকাকু খুন হয়েছেন?

হঠাৎ আকস্মিকতার কারণে অমিতাভর স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ।

আমি আসছি এখুনি।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এস। তুমি এলে বেরুব। আচ্ছা টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

রমেন্দ্রবাবু টেলিফোনটা রেখে দিতে লাইন কেটে যাওয়ার আওয়াজ হয়। আস্তে আস্তে অমিতাভও ছেড়ে দেয় টেলিফোনটা।

শুভেনবাবুর মত লোককে খুন কে করতে পারে? কেন? তবে কি—? নাঃ। বেড়িয়ে পড়ার তাড়ায় প্রস্তুত হয়ে নেয় অমিতাভ নিজের ঘরে এসে। জামা কাপড় পড়ে, ওয়াটার প্রুফটা কাঁধে নিয়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, সুপ্রিয় বসে বসে কি ভাবছে।

সরি সুপ্রিয়। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে রে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

অমিতাভ সুপ্রিয়কে বলে।

কি ব্যাপার ?

আমার এক বিশেষ পরিচিত লোক মার্ডারড হয়েছেন।

অমিতাভ জানায়।

কে ? আমি চিনি ?

সুপ্রিয় প্রশ্ন করে।

না। শুভেনবাবু বলে এক ভদ্রলোক। ঠিক চিনবি না তুই।

কোথায় থাকেন ?

বাগবাজারের দিকে।

ও—আচ্ছা, তাহলে আমি আজ উঠি। অরেকদিন আসব।

সুপ্রিয় অমিতাভর দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আস্তে আস্তে বলে, নিশ্চয়। পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। তবু তুই ত মনে করে এলি। আর আজই কথা বলতে পারলাম না। আসিস আরেক দিন আবার।

আমার ব্যাপার ত বুঝতেই পারছিস—বিজনেস। চল।

দুজনে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়! সুপ্রিয় বলে, ভদ্রলোক তোর কি রকম চেনা রে ?

খুব ক্লোসলি—মানে।

সরি। থাক। একদিন আয় না আমার পোলট্রি দেখতে। আউটিংও হবে। আমি প্রতি শুক্রবার রাত্রে যাই, আর রবিবার রাত্রে ফিরে আসি। আমার সঙ্গেও যেতে পারিস।

সুপ্রিয় বলে।

আচ্ছা। নেক্সট যেদিন তুই যাবি, সেদিন বাড়ীতে চলে আয় সময় করে।

ঠিক আছে। চল, তুই ত বাগবাজারের দিকে যাবি। তোকে পেঁৗছে দি বাড়ীতে।

না রে, আগে সাউদার্ণ প্লেসে যেতে হবে।

আচ্ছা। সো লঙ। এই কথাই রইল।

ঠিক আছে।

সুপ্রিয় গাড়ীতে উঠে চলে যায়। অমিতাভ দ্রুত পায় এগোতে থাকে সাউদার্ণ প্লেসে পাপিয়াদের বাড়ীর দিকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা একটু কমেছে মনে হয়। ট্যাক্সির প্রত্যাশায় রাস্তার দিকে চাইতে চাইতে এগুতে থাকে অমিতাভ।

পাপিয়াদের বাড়ীতে পেঁছায় অমিতাভ। গেট পেড়িয়ে ভেতরের দিকে এগোতে এগোতে উপর দিকে চায় অমিতাভ। বারান্দাটা ফাঁকা। পাপিয়া গত কদিন ওখান থেকে তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে। নিজের মনের অবস্থায় বাড়ীটাকেও যেন সে একই রঙে রাঙিয়ে নেয়। মনে হয়, যেন থমথম করছে। পাপিয়াদের বাড়ীটার সামনে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে।

উপরে উঠে আসে অমিতাভ। সেই ছোট্ট সাদা কুকুরটি দাঁড়িয়ে ছিল। অমিতাভকে শুঁকে পরিচিতের গন্ধ পেয়ে অমিতাভর সঙ্গে ভেতরে আসে পায়ে পায়ে।

রমেন্দ্রবাবু অস্থির ভাবে পায়চারী করছিলেন তখন। সুষমা দেবী একটি মোড়ার মাথায় হাত দিয়ে বিষণ্ণভাবে বসেছিলেন চুপ করে।

রমেন্দ্রবাবু অমিতাভকে দেখে বলে ওঠেন—

এসে গেছ। চল, এবার যাওয়া যাক।

তারপর সুষমা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

কই চল তাড়াতাড়ি। ওদিকে পাপি আবার একা রয়েছে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত না হয়ে পড়ে।

সুষমা দেবী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ান। ছোট্ট একটি শ্বাস ছেড়ে বলেন—

একটু দাঁড়াও। নান্নু একা থাকবে। বাহাদুরকে বলে যাই ভালো করে।

সুষমা দেবী ভেতরে চলে গেলে অমিতাভ রমেন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করে—

আচ্ছা, খবরটা পেলেন কি ক'রে ?

শম্ভু—

শম্ভু।

হ্যাঁ। শুভেনের চাকর। ওই টেলিফোনে জানিয়েছে ব্যাপারটা। তিনটের শোতে সিনেমা দেখতে গেছলি। তারপর ফিরে এসে দেখে শুভেন মাটিতে পড়ে আছে।

কি ক'রে খুন হলেন চিনিকাকু ?

অমিতাভ জানতে চায়।

ঠিক জানি না। মানে অত কিছু বলেনি আর কি। ওখানে গেলে জানতে পারব সব।

রমেন্দ্রবাবু আরো বলেন—

ভাবতে পারছি না, শুভেনের মত লোককে···

চল।

সুষমা দেবী এসে দাঁড়াল কথাটি বলে।

পাপিয়া ?

অমিতাভ আবার প্রশ্ন করে।

ওখানেই আছে।

কিন্তু ও বাড়ীতে থাকতে খুনটা হ'ল, আর জানাল চাকর।

ঠিক কথা। হয়ত সে বন্ধুর বাড়ী গেছে তাড়াতাড়ি। চল, মেয়েটাকে আবার নিয়ে আসতে হবে। যে রকম সফট্ হার্টেড্, বেশীক্ষণ এ অবস্থায় আমাদের ছেড়ে একা থাকলে কি করবে কে জানে ?

রমেন্দ্রবাবু বলেন।

চলুন।

নীচে নেমে আসেন তাঁরা নিঃশব্দে। গাড়ীতে ওঠার পর

রমেন্দ্রবাবু ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি যেতে নির্দেশ দেন। গাড়ী বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় সাম্ভাব্য গতিবেগে ছুটে চলে।

ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা অমিতাভর মাথায় উৎকণ্ঠা আর প্রশ্নগুলি ভন ভন করে ঘুরতে থাকে।

গাড়ী এগিয়ে চলে কলকাতার উপকণ্ঠে শুভেনবাবুর বাড়ীর দিকে। অমিতাভর মনে পড়ে প্রথম আলাপের পর ফিরে আসার সময় শুভেনবাবুর ক'টি কথা ঃ

একদিন কাউয়ার সঙ্গে আমার বাড়ীতে যাবেন। নেমন্তন্ন রইল।

তখন…

…শুভেনবাবুর একতলা বাড়ীটার সামনে পেঁৗছে তাঁরা দেখেন, পুলিশের কালোক্রশের গাড়ী, একটা ভ্যান, আর জীপ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ বাড়ীর দরজার সামনে মোতায়েন রয়েছে। এ পাশের কাছাকাছি একটি বাড়ীর জানলায় আর বারান্দায় কৌতুহলী মুখ। আর রাস্তায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে আরেক দল কৌতুহলী মানুষ। আলো মেঘের ফাঁকে যতটুকু বেড়িয়ে পড়ছিল, তাও কমে এসেছে সন্ধ্যার প্রস্তুতিতে। বাড়ীটার গায়ে যেন আজকের দুর্ঘটনার কালোছায়া আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। আতঙ্কিত নিঃশব্দতায় পরিবেশ গুমোট হয়ে গেছে যেন। মেঘলা দিনে অজানা কোন কুহেলী ঘিরে আছে স্তব্ধতায় আর কিছু শব্দে। বৃষ্টি থামলেও মেঘ আকাশে জমে রয়েছে।

অমিতাভরা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর ভেতরে যেতে গেলে পুলিশটি জানায় যে, ভেতরে বিনানুমতিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। অগত্যা তাঁরা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। অমিতাভর চোখ পাপিয়াকে খোঁজে।

কিছুক্ষণ বাদে পুলিশী পোষাকে একজন সাব-ইনস্পেক্টর হাতে ফাইল নিয়ে বেড়িয়ে আসেন। অমিতাভদের দেখে তিনি জিজ্ঞাসু চোখে প্রশ্ন করেন—আপনারা?

রমেন্দ্রবাবু জবাব দেন—আমার নাম রমেন্দ্র রায়। শুভেন আমার ভাই হয়। ওর এই দুঃসংবাদ পেয়ে আমরা এসেছি।

আপনারা খবর পেলেন কি করে? আবার প্রশ্ন করেন সাব ইনস্পেক্টর।

শুভেনের চাকর খবর দিয়েছে।

আচ্ছা। আপনারা বাইরের ঘরটায় বসুন। কারণ, ভেতরে আমাদের লোকজন কাজ করছে।

বডি কি রিমুভ করা হয়ে গেছে?

অমিতাভর প্রশ্নেব জবাবে সাব-ইনস্পেক্টর জানান, না এবার হবে। আর মিঃ রায় আপনি আইডেন্টিফাই করে দেবেন। এখন বসুন, সময় হলে ডেকে নেব।

ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার মেয়ে কি ভেতরে আছে?

আপনার মেয়ে? ভেতরে চাকরটি ছাড়া ত কেউ নেই।

রমেন্দ্রবাবু তার প্রশ্নের জবাব পান। তিনি বলেন, ও ঠিক আছে।

তারপর অমিতাভর দিকে ফিরে বলেন, দেখেছ, বলেছিলাম, নিশ্চয়ই বেড়িয়েছে। ভালই হয়েছে। ব্যাপারটা সহ্য করতে পারত না দেখে। চল যাই বসি গে।

অমিতাভরা ভেতরে এসে বসে। ভেতরের ঘরে পুলিশের কর্মব্যস্ততা বোঝা যায়। কয়েক মিনিট তারা নিথর হয়ে বসে থাকে সেই ঘরে। সাব-ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক আবার ঘরে আসেন। রমেন্দ্র বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি আসুন।

রমেন্দ্রবাবু উঠে তাঁকে অনুসরণ করেন। কিছুক্ষণ বাদে ষ্ট্রেচারের সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি দেহ বয়ে নিয়ে আসে বাহকের দল।

তাদের পিছনে পিছনে ঢোকেন রমেন্দ্রবাবু ও সাব-ইনস্পেক্টরটি। সাব-ইনস্পেক্টর দেহটির সঙ্গে বাইরে চলে যান।

রমেন্দ্রবাবু সুদীর্ঘ এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়েন বেতের সোফাটায়। সুষমা দেবী অস্ফুট আওয়াজ তুলে চোখে আঁচলটি তুলে দেন। অমিতাভ ভাবে, শুভেনবাবু আর তাদের নেমন্তন্ন করবেন না। আর 'নামে কিবা যায় আসে' কথাটির বিপক্ষে কিছু প্রমাণ করার জন্যে পাপিয়ার সঙ্গে খুনসুটিও করবেন না।

কিছুক্ষণ বাদে সাদা পোষাকে কয়েকজন লোক ঘরে ঢোকেন। নিম্ন স্বরে তাদের মধ্যে কথাবার্তার আদান-প্রদান হয়। ডাক্তার, প্রিন্ট এক্সপার্ট, ফটোগ্রাফার—এদের দেখে কে কি বুঝতে পারে অমিতাভ। আর তুজন সার্ট, প্যান্ট-পরা লোক, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের—আন্দাজ করে নেয় অমিতাভ। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক, আরেকজন যুবক। স্বপ্রতিভার সঙ্গে বুদ্ধিদৃপ্ততার ছাপ তাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করেছে। অমিতাভর দিকে যুবকটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রস্থানোদ্যত সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লোকাল থানার সেনগুপ্তকে পাঠিয়ে দেবেন তাড়াতাড়ি। তারপর রমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলেন যুবকটি, ভালই হয়েছে আপনাদের পেয়ে। যদিও আপনাদের খবর পাঠাতে হত।

কথার মধ্যে সাব-ইনস্পেক্টর সেনগুপ্ত এসে দাঁড়ান। বয়স্ক ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, স্যার আমাকে ডেকেছেন?

বয়স্ক ব্যক্তিটির পদমর্যাদা বোঝা যায় সেনগুপ্তের সম্বোধনে।

ইনস্পেক্টর বলেন, হ্যাঁ। এবার চাকরটার জবানবন্দীটা নিয়ে নিন।

ইয়েস স্যার।

বলে একটি চেয়ার দখল করে বসে পড়েন সাব-ইনস্পেক্টর। একজন কনেষ্টেবলকে ডেকে হুকুম দেন চাকরটিকে ডেকে আনতে। এর মধ্যে কাগজপত্র বার করে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

শম্ভু ডাক পেয়ে ঘরে আসে। সে ঘরে ঢুকে সুষমা দেবীর উদ্দেশ্যে বিষণ্ণ মুখে নমস্কার জানায়। তারপর সেনগুপ্তের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

সেনগুপ্ত গম্ভীরস্বরে বলেন, যে প্রশ্নগুলো করব, তার ঠিকমত সত্যি জবাব দেবে, বুঝেছ। নইলে বিপদে পড়বে।

আমি যা জানি তাই বলব বাবু।

ঠিক আছে। তোমার নাম কি?

সেনগুপ্ত তাঁর প্রশ্ন শুরু করেন।

শম্ভু পোড়েল।

বাবার নাম?

ঈশ্বর ফকিরদাস পোড়েল।

বাড়ী কোথায়?

বসিরহাটে বাবু।

দক্ষিণের না উত্তরের বসিরহাট।

উত্তরের বাবু।

তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ?

তা প্রায় বারো তেরো বছর হবে।

আজ দুপুরে কোথায় গেছিলে .

বায়স্কোপ দেখতে গেছিলাম।

হুঁ। বাবু জানতেন ছবি দেখতে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। বাবুর অনুমতি নিয়ে গেছিলাম।

কি ছবি দেখতে গেছিলে?

দিল কি বাহার।

বাঃ। বেশ, কোন প্রমাণ আছে?

প্রমাণ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

পকেট হাতড়ে একটা গোলাপী কাগজের টিকিটের অংশ

সেনগুপ্তের হাতে দেয় শম্ভু। তিনটি পুলিশ অফিসারের হাতে সেটি পরীক্ষিত হয়ে ঘোরে। সেনগুপ্ত আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, তোমাকে কেউ দেখেছিল সিনেমা হলে ?

না বাবু, তেমন কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

তোমার বাবু কি রকম লোক ছিলেন ?

মাটীর মানুষ বাবু। এরকম লোক—আর আমি কি বলব। বাবুর দাদা এখানে রয়েছেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, কাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে, সেটা জানতে চাইনি।

সেনগুপ্ত গম্ভীরকণ্ঠে শম্ভুকে বলেন। ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, তোমার বাবুর কাছে আজকে কারও আসার কথা ছিল বলে জান কিছু ?

তা ত জানি না বাবু।

হুঁ। কে কে আসতেন তোমার বাবুর কাছে ?

আমি সকলকে চিনি না। তবে দেখেছি মাঝে মাঝে।

কোন সন্দেহজনক লোককে বাবুর কাছে আসতে দেখেছ ?

না বাবু। কারবারের লোকজনই বেশী আসতেন। আর তাদের সকলেরই প্রায় মুখ চিনি।

তাঁদের মধ্যে কারো সঙ্গে তোমার বাবুর ঝগড়া হয়েছিল—কোন কিছু ব্যাপার নিয়ে ?

বাবু ঝগড়াঝাটি একেবারেই পছন্দ করতেন না। আর ঝগড়াও কোনদিন শুনিনি।

একটু থেমে শম্ভু আবার বলে, তবে বাবু, গত পরশু দিন এক ছোকরা মত বাবুর সঙ্গে কি ব্যাপার নিয়ে একটু চটাচটি হচ্ছিল শুনেছি।

কি ব্যাপারে ?

উৎসুক হয়ে ওঠেন ইনস্পেক্টর।

তা ত জানি না বাবু। তাছাড়া কথাবার্তা একটু বাদে শেষ হয়ে যায়। আর ছোকরা বাবুটি হন হন করে বেড়িয়ে চলে যান।

ছোকরাবাবুটির নাম জান?

না বাবু।

দেখলে চিনতে পারবে?

হ্যাঁ। তবে ইদানীং বিকাশ দাদাবাবুর সঙ্গে ওনার প্রায়ই একটু কথা কাটাকাটি হত।

কারণটা যে কি তা অমিতাভ বুঝতে পারে। ইনস্পেক্টর প্রশ্ন করেন, কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হত?

মানে ঐ পয়সাকড়ি নিয়ে বাবুর সঙ্গে একটু ঝগড়া হত।

বিকাশবাবুটি কে?

আজ্ঞে, ওনার ভাগ্নে।

ঠিক আছে। সেনগুপ্ত ক্যারী অন।

সেনগুপ্ত একমনে নোট নিয়ে যাচ্ছিলেন। কথা শুনে মাথা তুলে শম্ভুকে দেখেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন—

তুমি যখন সিনেমা দেখতে বাড়ী থেকে বেরুলে বাবু তখন কি করছিলেন?

বাবু তখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন। আর পাপিয়া দিদিমনি ও ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন।

তারপর—

আমি বাবুকে বাইরের দরজা দিতে বললাম। বাবু উঠে এসে দরজা দিয়ে গেলেন।

ইনস্পেক্টর এবার চিন্তিত মুখে যুবক সহকর্মীটির দিকে চেয়ে বলেন—

দরজা দেওয়া ছিল। তাহলে শুভেনবাবু যাদের ঘরে আনেন, তারা পরিচিত। কি বল?

তাই ত মনে হচ্ছে।

যুবকটি জবাব দেন।

ইনস্পেক্টর সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে বলেন—

ঠিক আছে, আপনি শেষ করে নিন।

আচ্ছা, তুমি যখন বাড়ী ফিরলে বাবুকে কোথায় দেখলে ?

বাবুর ঘরেই।

কি রকম অবস্থায় ?

আজ্ঞে, বায়স্কোপ দেখে ফিরে এসে বাইরের দরজাটা খোলা দেখে ভাবলাম, বাবুই খুলেছেন। চা খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে বাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, বাবু মেঝেতে এলিয়ে পড়ে আছেন। চোখ জিব ঠেলে বেড়িয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দিদিমনিকে ডাক দিলাম। কিন্তু দিদিমনির সাড়া পেলুম না। ভাবলাম হয়ত বেড়িয়েছেন। তাই আমি নিজেই আপনাদের এবং এ বাবুকে খবর দিয়েছিলাম।

শম্ভু রমেন্দ্রবাবুকে নির্দেশ করে।

ঠিক আছে তুমি এখন যাও।

সাব-ইন্স্পেক্টর সেনগুপ্ত তাকে নির্দেশ দেন।

এক মিনিট। দেখ ত, এ রকম কোন রঙের ওয়াটার প্রুফ গায়ে লোককে আসতে দেখেছ ?

চুপ করে বসে থাকা যুবক অফিসারটি প্রশ্ন করেন শম্ভুকে এবং মুঠি খুলে মেলে ধরে পলিথিনের ওয়াটার প্রুফের ছেঁড়া একটি অংশ, যা মৃত্যুর কবজায় শুভেনবাবু তাঁর শক্ত হাতে শেষ চেষ্টায় ছিঁড়ে নিয়েছেন। অমিতাভও দেখে।

শম্ভু সেটিকে দেখে ঘাড় নেড়ে জানায়—না।

ঠিক আছে, যাও। দরকার হলে তোমাকে যেন পাওয়া যায়।

আবার ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দ সম্মতি জানিয়ে শম্ভু বাড়ীর ভিতর দিকে চলে যায়।

শম্ভু চলে যেতে যুবক অফিসারটি রমেন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে বলেন—

এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। আচ্ছা, শুভেনবাবু আপনার আপন ভাই?

না, খুড়তুত।

আপনাদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ সৌহার্দ্দ ছিল বলে মনে হচ্ছে?

তা ছিল।

আচ্ছা, শুভেনবাবু এ রকম ভাবে খুন হওয়ার কি কারণ আপনার মনে হয়?

সেটা যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে ত অনেক কিছু হত।

প্রশ্নটা করলাম অবশ্য দুটো জিনিষ পাওয়ার পর। একটি দেখে চিনতে পারছি, পেড়েকের প্যাকেটের মধ্যে কোকেন। প্রায় হাফ-আউন্স মত ছিল। আপনাকে তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন আলো দেখাতে পারেন কিনা?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—মানে কোকেন দিয়ে শুভেন কি করবে?

আমাদেরও সেই প্রশ্ন।

না, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারছি না।

আচ্ছা—আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

না সে রকম কাউকে ত ভেবেই পাচ্ছি না। আচ্ছা, আরেকটা কি পেয়েছেন?

রমেন্দ্রবাবু উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন।

যুবকটি ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ চোখে চুপ করে থেকে হঠাৎ বলেন—

গোল্ড। সোনার বারের ভাঙ্গা ছোট ছোট দু চারটে টুকরো।

গোল্ড। আমি—আমি—আগে পিছে কিছু বুঝতে পারছি না। তবে কি শুভেন একজন—

রমেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বসে থাকেন। শেষে শুভেনবাবুর উপর

সন্দেহে গলাটা বুঁঝে আসে। তিনি মুহ্যমানের মত মাটির দিকে চেয়ে বসে থাকেন।

তাহলে আপনার সন্দেহ কাউকে হয় না?

যুবকটির কথার উত্তরে হতবাক রমেন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে শুধু না, বলেন।

বিকাশবাবু সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

যুবকটি আবার প্রশ্ন করেন।

এ্যাঁ।

চমক ভেঙে রমেন্দ্রবাবু বলেন—

যুবকটি আবার তাঁকে প্রশ্নটি করেন।

রমেন্দ্রবাবু বললেন—

ছেলেটা বেয়াড়া গোছের বটে। তবে মামাকে—

অনেক কিছু মনে হয়, কিন্তু তা ঘটে না। বিপরীত দিক থেকে দেখলে একই। যাক, বলতে পারেন, শুভেনবাবু মারা যাওয়াতে কে বেনিফিটেড্ হবে?

আমার সে সম্বন্ধে কোন কিছু সম্পূর্ণ ভাবে জানা নেই। তবে যতটুকু শুনেছি সম্পত্তি সব বিকাশ পাবে। আর ব্যাঙ্কের টাকা যা আছে সেটা পাপিয়া পাবে। আগেই বলেছি ভালো ভাবে জানি না।

রমেন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে থেমে বলেন অফিসার তিনজনকে উদ্দেশ্য করে।

পাপিয়া যে নামটা বললেন, তিনি কি আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা খুব শকিং হচ্ছে আমার কাছে। শুভেন কি শেষকালে স্মাগল শুরু করেছিল।

যুবকটি ক্ষণকাল ভেবে নিয়ে ও প্রসঙ্গে কোন মতামত প্রকাশ না করে যেন কতকটা নিজের মনেই জিজ্ঞেস করেন—

কিন্তু জিনিষটা এল কি ক'রে? গোল্ডটা নিজের হলেও হতে পারে। কিন্তু কোকেন? তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করেন—

আচ্ছা, আপনার মেয়ে কি এখন এখানে আছেন ?

হ্যাঁ।

যদিও শাড়ী ভেতরের একটা ঘরে দেখে মহিলার উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছি, তবে কার সেটা জেনে নিলাম। যাই হোক, আমার আরেকটা প্রশ্ন, উনি কি মাঝে মাঝে এখানে থাকেন ? আর ওনাকে ত দেখছি না।

না। এইবারই প্রথম এল। শুভেনই ওকে জোর করে নিয়ে এসেছিল। না দেখার কারণ, বোধহয় ও একটু বেড়িয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে হয়ত জানেও না কিছু।

শুভেনবাবু, আপনার মেয়েকে খুব স্নেহ করতেন ?

হ্যাঁ। বলতে গেলে পাপিকে মানে আমার মেয়েকে নিজের মেয়ের মতই দেখত। আর আমাদের বাড়ীতে যেত অনেকটা পাপিরই টানে।

রমেন্দ্রবাবু জানান।

ও। আচ্ছা, কোন কথা আপনাদের কাছে কি উনি বলেছিলেন, যাতে কেউ তাব ক্ষতি করার চেষ্টা বা ওনার শত্রু হয়ে পড়েছেন, এমন কথা প্র৺.শ পায়।

না, সে রকম কোন কথাই বলে নি কোনদিন।

রমেন্দ্রবাবু চিন্তা করে নিয়ে বলেন।

অমিতাভ বলে ওঠে কথার মাঝে—

কিছু মনে করবেন না, একটি কথা বলব।

ইন্‌স্পেক্টর ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে গম্ভীর কে বলেন—

বলুন।

সেদিন মানে দিন তিন চার আগে আমার মনে আছে বিকা বাবু কি একটা জানেন বলে কথায় ইঙ্গিত করেছিলেন। তাতে চিা কাকু মানে শুভেনবাবু একটু এক্সাইটেড্ হয়ে পড়েন। আমা

মনে হয় বিকাশবাবু হয় ত কথাটা জানতে পারেন। আমি জোর দিয়ে বলছি না, হয় ত বিকাশবাবু কিছুটা হেল্পফুল কথা জানাতেও পারেন।

হুঁ।

আর কিছু বলেন না ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক। যুবকটি রমেন্দ্রবাবুকে অমিতাভর দিকে নির্দ্দেশ করে বলেন—

ইনি কে?

রমেন্দ্রবাবু বলেন—

ইনি অমিতাভ চৌধুরী। আমাদেরই বাড়ীর ছেলের মত।

ও। আচ্ছা উনি যা বললেন তার সম্বন্ধে কিছু জানেন?

মনে পড়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ অমিতাভ। বিকাশ একটা কি ইঙ্গিত করেছিল যেন? আমিও তখন সামনে ছিলাম।

মিঃ রায়, আপনার কানে কোন ঘটনা বা শুভেনবাবুর মনের অবস্থার তারতম্যের কথা, বা কারণ শোনেন নি গত কয়েক দিনের মধ্যে?

না, সে রকম কোন কিছু দেখি নি, বা শুনিনি। তাছাড়া এমনিতে শুভেন খুব জোভিয়াল টাইপের ছিল। হাসি ঠাট্টা করেই কাটাত আমাদের সঙ্গে থাকলে। একটু চাপা স্বভাবেরও ছিল, বোঝা যেত না কিছু বাইরে থেকে। এক্সাইটেডও হতে দেখি নি কোনদিন—খালি, লাষ্ট টাইম ঐ দিন তিন চারেক আগে বিকাশের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই যা একটু উত্তেজিত হয়ে গেছিল—এছাড়া কোনদিন দেখিনি।

ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ। বাই দি ওয়ে, ওর বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে?

না, কাউকেই আমি চিনি না।

অনেক ধন্যবাদ।

যুবকটি স্মিত হেসে বললেন। তারপর সুষমা দেবীর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—

মিসেস রায়, আই প্রিজিউম্। আপনার কিছু বলার আছে?

সুষমা দেবী নিঃশব্দে নেতিবাচক ঘাড় নাড়েন।

সাব-ইনস্পেক্টর সেনগুপ্ত ফাইলে কাগজপত্র বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—

স্যার, আমি বাইরে যাচ্ছি।

ঠিক আছে।

ইনস্পেক্টর অনুমতি দেন।

সাব-ইনস্পেক্টর সেনগুপ্ত বেড়িয়ে যেতে রমেন্দ্রবাবু কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞাসা করেন—

শুভেনকে মারা হয়েছে কি ভাবে?

একটা কর্ডে। দুজন লোকের উপস্থিতি আমরা বুঝতে পেরেছি। খুব সম্ভব একজন চেপে ধরে। আরেকজন কর্ডটি গলায় পড়িয়ে দেয়।

জবাব দেন যুবক অফিসারটি।

হরি বল।

রমেন্দ্রবাবুর উক্তির মাঝে ইনস্পেক্টর বলেন—

এক্সয্যাকলি সেন, চল যাই। বাই দি বাই, শুভেনবাবুর সলিসিটর কে?

সলিসিটর হচ্ছে সৌরেন মুখার্জী। পার্ক লেনে থাকেন।

দুজনে উঠে দাঁড়াতে রমেন্দ্রবাবু বলেন—

আমরা তাহলে ভেতরে একটু বসতে পারি? কারণ, আমার মেয়ে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে।

সিওর। ভালো কথা, আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন। সেন, নোট করে নাও।

রমেন্দ্রবাবু, তাঁর সাউদার্ণ প্লেসের বাড়ীর ঠিকানা বলেন এবং

যুবক অফিসারটি যাঁর পদবী সেন, সম্বোধনে বোঝা গেল, তিনি লিখে নেন। তারপর বলেন—

মিস রায়কে অল্প আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব না। কাল সকালেই যা জানবার জেনে নেব। হয়ত উনি কিছু ইনফরমেশন দিতে পারবেন।

এক্সিউজ মি, আপনাদের নামটা জানাবেন। অবশ্য আপত্তি যদি না থাকে।

রমেন্দ্রবাবু বললেন।

এ, কে, সেন। আর ইনি ইনস্পেক্টর এস, বাগচী।

নিজের এবং ইনস্পেক্টরের নাম জানান মিঃ সেন।

নমস্কার।

নমস্কার। আমরা এখন যাচ্ছি।

মিঃ বাগচী ও মিঃ সেন ঘর থেকে বাইরে চলে যাবার পর রমেন্দ্রবাবুরা বাড়ীর ভেতরে আসেন। যে ঘরে শুভেনবাবুর দেহ পাওয়া গেছিল, সে ঘরটা পুলিশ সিল করে দিয়ে গেছে। দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে অমিতাভ ভিতরটা দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু দরজা, জানলা বন্ধ করা অন্ধকার ঘরে কিছুই নজরে আসে না।

তাঁরা পাশের ঘরটিতে আসেন সকলে। সে ঘরটি—তিনটি ঘর নিয়ে শুভেনবাবুর একতলা বাড়ীর অন্যতম ঘর এটি। সামনে দিয়ে প্যাসেজ—যাতায়াতের জন্য। ঘরটিতে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই বলতে গেলে। ছোট একটা আলমারী। এক কোণে একটা বেতের টেবিল ও দুটি বেতের চেয়ার। টেবিলটির উপর ফিতে,. পাউডার কেস, চিরুণী। তার উপর একটা ছোট আয়না ছোট্ট দুটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে লম্বা একটা চিরুণী।. পাপিয়ারই সমস্ত বোঝা যায়। আর জানলার পাশে একটা সিঙ্গল বেডের নীচু খাট। তার তলায় ঘরে পড়ার মেয়েদের একটা স্লিপার। একটা আলনা—তাতে একটা শাড়ি আর ম্যাচ্ করা ব্লাউজ-

গুছিয়ে রাখা। অমিতাভ ভালো করে চারদিকটা দেখে নেয়। তারপর চিন্তিত মুখে পায়চারী করে। রমেন্দ্রবাবু ও সুষমা দেবী খাটটিতে বসে পড়েন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সুষমা দেবী ঘরের আলোটা জ্বেলে দেন। ঘরের ওয়াল-ক্লকটার শব্দ ছাড়া সকলে নিঃশব্দে বসে রইল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে রমেন্দ্রবাবু বলে ওঠেন—

শুভেন এরকম করে মারা যাবে ভাবতেই পারা যায় নি। কিন্তু একটা কথা কি ভাবছি জান—

সুষমা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন—

শুভেন কি স্মাগলারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখে চলছিল? বিশ্বাস হয় না আমার।

আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না। কি বল অমিতাভ?

সুষমা দেবী রমেন্দ্রবাবুকে সমর্থন করে বলেন।

অমিতাভ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। তবে কি শুভেনবাবু স্মাগলিঙের কোন দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন? হয় ত তারা কোন কারণে শুভেনবাবুকে সরিয়ে দিয়েছে? না কি ঘটনাটার সঙ্গে অন্য কোন যোগাযোগ আছে? অমিতাভ কিছুই ভেবে পায় না।

আচ্ছা, পাপিয়া কোথায় গেল বল ত? এখনও দেখা নেই মেয়েটার।

সুষমা দেবী রমেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন।

গেছে বোধহয় কোন বন্ধুর বাড়ীতে। এসে যাবে এখুনি। এক কাজ কর তুমি, ওর জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নাও। এলেই বাড়ীর দিকে রওনা দেব।

রমেন্দ্রবাবু বললেন।

বিশেষ কিছুই ত আনে নি। একদিন থাকবে বলেছিল। তা আমি গুছিয়ে নিচ্ছি।

সুষমা দেবী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

অমিতাভ ঘরের বাইরের দিকে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে একটু উজ্জ্বল উত্তেজিত চোখ নিয়ে ঘরে আসে। চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত মুখ।

সুষমা দেবী তখন আলনা থেকে নামান শাড়ী ব্লাউজটা ভালো করে ভাঁজ করে খাটের উপর রাখলেন। অমিতাভ দ্রুত কাছে গিয়ে শাড়ীটাকে ভালো করে দেখে, তারপর সুষমা দেবীকে জিজ্ঞেস করে—পাপিয়া কটা শাড়ী সঙ্গে এনেছিল?

দুটো।

সুষমা দেবী একটু বিস্মিত স্বরে জবাব দেন।

একটা ভালো শাড়ী, আরেকটা ঘরে পড়ার মত।

হ্যাঁ।

আরেকটু বিস্মিত স্বরে সুষমা দেবী জবাব দেন এবং অমিতাভর দিকে চেয়ে থাকেন।

এই সিফনটা ঘরে পড়ার জন্য নয় নিশ্চয়ই।

একদমে আবার প্রশ্ন করে অমিতাভ।

দুটো জুতোর বেশী নিশ্চয়ই আনে নি সঙ্গে?

কি ব্যাপার বল ত?

সুষমা দেবী প্রশ্ন করেন জবাব না দিয়ে।

খাটের তলাকার স্লিপারটা কার?

পাপিয়ার।

বিস্ময়ের চূড়ান্ত সীমার দিকে সুষমা দেবী আর রমেন্দ্রবাবু এগোতে থাকেন অমিতাভর আচরণে।

রমেন্দ্রবাবু বলেন—কি হয়েছে? তুমি এ রকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছ কেন?

কিছু জবাব না দিয়ে দ্রুত বাইরে চলে যায় অমিতাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে একটি জরির কাজ করা চপ্পল হাতে করে, বলে—এটা কার?

সুষমা দেবী ভালো করে দেখে বলেন—পাপিয়ার।

লালবাজার।

লালবাজার? উইল ইউ প্লিজ পুট মি টু ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট?

জাষ্ট এ মোমেণ্ট প্লিজ।

কিছুক্ষণ পরে শোনা যায় গম্ভীর কণ্ঠ—হ্যালো।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট?

হ্যাঁ, বলুন।

কাইগুলি সাব-ইনস্পেক্‌টর এ. কে. সেনকে একটু ডেকে দেবেন? একটা জরুরী দরকার?

কে আপনি?

ওদিক থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে।

অমিতাভ—মানে, দেখুন নাম বললে উনি হয়ত ঠিক চিনবেন না। বলুন, আজকের বিকেলের কেসটার সঙ্গে জড়িত আরেকটা ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলব।

অমিতাভ জবাবে জানায়।

একটু ধরুন।

কিছুক্ষণ ওদিকে নিস্তব্ধতা থাকার পর গলার আওয়াজে উপস্থিতি বোঝা যায়—হ্যালো!

হ্যালো—মিঃ সেন?

হ্যাঁ, বলুন।

আমি—মানে আমার সঙ্গে—আপনি টেলিফোনে জানাতে বলেছিলেন।

অমিতাভর যেন কথার খেই থাকে না।

অমিতাভবাবু কথা বলছেন ত?

হ্যাঁ।

বলুন।

পাপিয়া এখনও ফেরেনি।

ফেরেন নি!

না।

শুনুন, আপনাদের বাড়ীতে আই মিন মিঃ রায়ের বাড়ীতে খোঁজ নিয়েছেন?

না, তা অবশ্য খোঁজ নেওয়া হয় নি। তবে যে বাড়ীতে আজকের দিনটা থাকার কথা, সে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে সেখানেই ফিরে আসা স্বাভাবিক। আর রাতও হয়েছে অনেক।

রাইট।

একটু চিন্তিত শোনায় মিঃ সেনের গলাটা।

পাপিয়া এত রাত অবধি বাইরে থাকে না।

সুষমা দেবী কান্না ভেজা গলায় বলেন।

এ্যাঁ, কিছু বললেন?

সুষমা দেবীর কথা বলার আওয়াজে প্রশ্ন করেন মিঃ সেন।

মানে মিসেস রায় বলছিলেন, পাপিয়া এত রাত অবধি বাইরে থাকে না।

দেখুন, তবু আপনি বাড়ীতে একটা খবর নিন। আমি এদিকে সব ব্যবস্থা করে রাখছি। ও বাড়ীতে যদি না গিয়ে থাকেন, আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন।

একটু থেমে মিঃ সেন আবার বললেন—

আর মিস রায়ের পার্টিকুলার্স মানে বয়স, গায়ের রঙ, উচ্চতা এই সব আর কি, আমাকে তখন বলে দেবেন। আমি সব ঠিক করে দেব। কেমন?

আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এখুনি জেনে নিচ্ছি।

হ্যাঁ, তাই করুন। ছেড়ে দিচ্ছি।

অমিতাভ টেলিফোন নামিয়ে রাখে।

কিছুক্ষণ পর টেলিফোনটা তুলে ডায়াল করতে করতে কল্পনা করে অমিতাভ—হয়ত ওদিক থেকে ভেসে আসবে—

দিদিমণি এখানে আছেন। ডেকে দেব। কিংবা পাপিয়ার গলা ভেসে আসবে—

হ্যালো—ফোর সিক্স···

হ্যালো। হ্যালো।

ওদিক থেকে বাহাত্বরের গলা ভেসে আসে।

হ্যালো, কে, বাহাত্বর ?

জী।

বাহাত্বরের সসম্ভ্রম উক্তি ভেসে আসে।

পাপিয়া দিদিমণি কি এখানে ফিরে এসেছে ?

জী নেহি। দিদিমণি ত ইহা নেহি আয়া।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেড়ে দিচ্ছি।

লাইন কেটে দিতে রমেন্দ্রবাবু উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—

কি, ফিরেছে ?

নিঃশব্দে অমিতাভ মাথা নেড়ে পাপিয়ার ও বাড়ীতে অনুপস্থিতির কথা জানায়।

তবে কি ? অমিতাভ তাহলে···

রমেন্দ্রবাবুর অসম্পূর্ণ কথায় অমিতাভ বলে—আমি লালবাজারে আবার ফোন করছি। মিঃ সেনকে পাপিয়ার পার্টিকুলার্স জানিয়ে দিন।

একবার ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের লাইন এনগেজড থাকার পর পুনরায় লাইন পাওয়া গেলে মিঃ সেনই ফোনটা ধরেন।

হ্যালো।

হ্যালো, আমি অমিতাভ কথা বলছি। শুনুন, পাপিয়া ও বাড়ীতেও নেই। পাপিয়ার সম্বন্ধে আপনি যা জানতে চান মিঃ রায় জানিয়ে দিচ্ছেন। একটু ধরুন, মিঃ রায়কে দিচ্ছি—

মিঃ সেনকে জানিয়ে টেলিফোনটা রমেন্দ্রবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে অমিতাভ।

রমেন্দ্রবাবু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোনটা ধরেন।

কে, মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

মিস রায়ের পার্টিকুলার্স সম্বন্ধে কতকগুলো কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব। সেগুলি যতদূর সম্ভব ঠিক করে জানাবেন। প্রথম আপনার মেয়ের নাম।

পাপিয়া রায়।

পাপিয়া রায়।

লিখতে লিখতে মিঃ সেন বলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, এলারেস কিছু আছে কি?

না।

বয়স?

সতের বছর দু'তিন মাস হবে।

আচ্ছা, হাইট?

ফাইভ ফিট এণ্ড ফাইভ ইঞ্চেস।

কমপ্লেকসন?

ফেয়ার।

কলর অব দি হেয়ার?

ব্ল্যাক।

কলর অব দি আইজ?

ব্ল্যাক।

এনি ডিস্টিংগুইশিড মার্ক?

কাটা মার্ক অন রাইট আই ব্রো।

ঠিক আছে। আমি এখুনি সবকিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আরো যদি কিছু জানবার থাকে, আপনাদের কাছ থেকে পরে জেনে নেব। আর শুনুন, একটা ফটো পাঠিয়ে দিন এখুনি।

আচ্ছা।

কাল সকালে আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। এই ধরুন আটটা নাগাদ আসব।

আচ্ছা।

ডোণ্ট ওরি। ছেড়ে দিচ্ছি।

রমেন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে টেলিফোনটা রেখে দেন। অমিতাভকে ক্লান্ত ভারাক্রান্ত স্বরে বলেন—

অমিতাভ চল এবার। অপেক্ষা করে লাভ নেই। তোমার সন্দেহই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। জুতো জামা এখানে। বন্ধুর বাড়ীতেও যায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলেন—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমাদের বাড়ী থেকে পাপিয়ার একটা ফটো নিয়ে লালবাজারে পেঁ াছে দিতে হবে। কিছু মনে করো না। আমার কিছু ভালো লাগছে না, তাই আমি বেরুব না।

আমিই দিয়ে আসবো'খন। অমিতাভ বলে।

কই চল।

সুষমা দেবীর উদ্দেশ্যে বলেন রমেন্দ্রবাবু।

অভিব্যক্তিহীন, নিষ্পলকশূন্য দৃষ্টিতে বসে থাকা সুষমা দেবী একবার তাদের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

অমিতাভ বলে—এক মিনিট। পাপিয়ার জিনিষগুলো নিয়ে নি।

দ্রুত হাতে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে সুষমা দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

রমেন্দ্রবাবু শম্ভুকে ডেকে বলেন—আমরা যাচ্ছি, বুঝলি।

শম্ভু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে মাথা নাড়ে।

নিথরভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা সুষমা দেবীকে বলে, চলুন।

সুষমা দেবীর হাত ধরে, আস্তে আস্তে তাঁকে নিয়ে এগোয় অমিতাভ। বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়ীটার দিকে চায় একবার।

বাড়ীটা যেন নীরবে আজকের সমস্ত ঘটনার ছাপ গায় মেখে হানাবাড়ীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে সুষমা দেবীকে বসিয়ে দেয় অমিতাভ। অমিতাভ নিজের মনেও কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করে। গলার কাছে এসে অব্যক্ত আবেগ দানা পাকিয়ে ওঠে।

শুভেনবাবু। পাপিয়া। পিউ। এক হাহাকার যেন তাড়া করে আসে ভয়ার্তভাবে চতুর্দিক থেকে।

আকুলতা...

...অমিতাভ শুয়ে শুয়ে ভাবে। অসংখ্য অসংলগ্ন চিন্তা আর প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে থাকে মনে। লালবাজারে পাপিয়ার ফটোটা পেঁাছে দিতে যাবার সময় রমেন্দ্রবাবু বলেছিলেন যে, অমিতাভ যেন সকালে আসে একবার। তারপর রমেন্দ্রবাবুর ড্রাইভার অমিতাভর কাজ সারার পর বাড়ীতে পৌনে বারোটা নাগাদ পেঁাছে দিয়ে গেছে। কোনমতে কিছু মুখে দিয়ে দুশ্চিন্তা আর উত্তেজনায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়েছে সে। কিন্তু সেই থেকে চিন্তা আর প্রশ্নের ঘুর্ণীয়মান বেগ ঘুমকে কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। সঙ্গে রয়েছে দুশ্চিন্তা। জীবনে এ ধরণের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বিনিদ্র চোখে প্রশ্নোত্তর করে চলে অমিতাভ, নিজের মনে মনে।

শুভেনবাবু খুন হলেন কেন? বিকাশ কি এর জন্য দায়ী? বিকাশের চারিত্রিক বৈশিষ্টে এ ধরণের কাজ অসম্ভব নয়। কিন্তু পাপিয়ার এ রকম ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণ কি? পাপিয়া কি তাহলে কিছু দেখে ফেলেছিল? এবং সেই দেখে ফেলাটাই খুনীদের পাপিয়াকে গুম করতে বাধ্য করেছে। শুভেনবাবুর কাছে কোকেন, সোনা—এ দুটো কেন পাওয়া গেল। শুভেনবাবু কি সত্যিই এ রকম কোন ব্যবসা করতেন? কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ত

তা মনে হয়নি। পাপিয়াকে যদি ওরা শুভেনবাবুর মত একেবারে সরিয়ে ফেলে। সেটাও ত অসম্ভব নয়। একটা অস্থিরতা অমিতাভর দেহকে নাড়া দিয়ে যায়। না—না—না, এ হতে পারে না। কিন্তু সত্যিই যদি ঘটে গিয়ে থাকে। কি করবার আছে। অসহ্য। কালকের কাগজে হয়ত···। না, এ চিন্তা থাক। শূন্য চোখে জানলটা দিয়ে শুয়ে শুয়ে বাইরের আকাশটার দিকে চেয়ে থাকে সে। আকাশ এখনও মেঘলা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। তাই শূন্যতাতেই হাতড়ে বেড়ায় অমিতাভ।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই লালবাজার থেকে পাপিয়ার খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

নেম—পাপিয়া রায়।

এজ্—সেভেনটিন্ ইয়ার্স থ্রি মান্থস্।

হাইট—ফাইভ ফিট্ এণ্ড ফাইভ ইঞ্চেস্।

কমপ্লেকসন—ফেয়ার।

কলর অব দি আইজ্—ব্ল্যাক।

ডিষ্টিংগুইশিড মার্ক—কাটা মার্ক অব রাইট আই ব্রো।

টানা টানা চোখের এই মেয়েটা মিসিং। ছবি সাথে নিয়ে খবরটা বুঝি তৎপরতা সৃষ্টি করেছে এতক্ষণে। কোথায় গেল সে?

টং···টং···টং। ক্লান্ত শরীরটায় এবার একটু ঝিমুনি আসে। চোখ বোঁজে অমিতাভ।

নিশ্চিন্ত ঘুম অমিতাভর হয় না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে বিছানায় চোখ মেলে চায় সে। সকালের আলো জানলায় এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। সেখান থেকে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে সাতটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকী আছে। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে তোলে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাত্যহিক কর্তব্য সেরে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অমিতাভ সাউদার্ণ প্লেসের দিকে বেড়িয়ে পড়ে।

পাপিয়াদের বাড়ীতে আটটা বাজতে কিছু আগে পেঁছায়। গেট পেড়িয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায় অমিতাভ। বসবার ঘরে সোফাটায় নান্নু চুপ করে বসে আছে। অমিতাভ ঘরে আসতে নান্নু চোখ তুলে তাকে দেখে।

অমিতাভ বলে—নান্নু চুপ, করে একা বসে আছ যে।

ভালো লাগছে না।

নান্নু জবাব দেয়। একটু থেমে বলে—বাবাকে ডেকে দেব?

হ্যাঁ।

নান্নু উঠে ভেতরে চলে যায়। অমিতাভ অবসাদে ভরা শরীরটাকে সোফাটাতে এলিয়ে দেয়।

স্লিপারের আওয়াজ তুলে রমেন্দ্রবাবু ঘরে আসেন। এক রাত্রিতে তাঁর যেন বয়স আরো বেড়ে গেছে বলে মনে হয়। কিছুটা শীর্ণ দেখাচ্ছে। রমেন্দ্রবাবু এসে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে নিজেও সেটিতে গা এলিয়ে দেন।

কয়েক মিনিট ওরা চুপ করে বসে থাকে। রমেন্দ্রবাবু প্রথম কথা বলেন—

ওঃ, এ রকম একটা ব্যাপার যে আমার জীবনে ঘটবে, তা আমি কল্পনাও করি নি অমিতাভ। একে শুভেনের এ রকম মৃত্যু, তার উপর মেয়েটার সম্বন্ধে দুঃশ্চিন্তা। কোন কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছি না।

মিসেস রায় কেমন আছেন?

অমিতাভ প্রশ্ন করে।

সি হ্যাড্ এ স্লিপলেস নাইট উইথ মি। আর মাঝেমাঝে গুমরে গুমরে কেঁদেছে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলেন রমেন্দ্রবাবু।

এমন সময় কলিঙবেলটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তোলে।

রমেন্দ্রবাবু কলিঙবেলের আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়ান। বাহাদুর

ভেতর থেকে এসে দৌড়ে নীচে নেমে যায় আগন্তুকের প্রয়োজন অনুসন্ধানে। রমেন্দ্রবাবু এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখটাতে গিয়ে দাঁড়ান।

কয়েক মুহূর্ত কি দেখে নিয়ে আবার বসে পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে জুতোর আওয়াজ তুলে বাহাদুরের সঙ্গে হাতে একটা ফাইল নিয়ে মিঃ সেন ঘরে এসে ঢোকেন। সহানুভূতির হাসি নিয়ে বলেন—

আপনাদের এ রকম ডিষ্ট্রেসের সময় কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত।

না, না, আপনার এতে সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই। এটা ত আপনার ডিউটীর মধ্যে।

রমেন্দ্রবাবু বলেন। তারপর বাহাদুরকে বলেন—

বাহাদুর তিন কাপ চা আউর ব্রেকফাষ্টকে লিয়ে কুছ লে আও।

জী।

বাহাদুর চলে যাচ্ছিল।

এক মিনিট ঠাহরো।

মিঃ সেন বাহাদুরকে বাধা দেন বলেন—

মায়জীকো ইঁহা আনে বোলো।

বাহাদুর সম্মতি মুখে ঘার নেড়ে চলে যায়।

আপনি বলুন মিঃ সেন।

রমেন্দ্রবাবুর কথায়, তাঁর পাশে বসতে বসতে মিঃ সেন বলেন— আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। হয়ত প্রশ্নগুলোর সময় দুজনের মধ্যে কারো কিছু বলার থাকতে পারে। সেইজন্য ওনাকে আসতে বললাম।

শুভেনের কেসটার কতদূর কি হ'ল?

রমেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করেন।

দেখুন, ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড। এক, ওনার ঘরে দুটো

সন্দেহজনক জিনিষের অবস্থিতি। আর তুই, ওঁর খুন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস রায়ের নিরুদ্দেশ। আমাদের সব কটা দিক ভাবতে হবে। মিস রায়ের ডিসএপিয়ারেন্সটাই একটু কমপ্লিকেটেড করেছে।

সুষমা দেবী কথার মাঝে ঘরে এসে ঢোকেন। সারা রাত্রি ধরে কান্নার ফলে চোখটা ফুলেছে, আর লাল হয়ে গেছে। মলিনতা ঘিরে ধরেছে সারা মুখে। সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তা আর শোকে মুহ্যমান ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আরেক সোফাতে এসে বসেন।

মিঃ সেন তাঁর দিকে একবার দেখে বলেন—

আমি বেশী সময় নেব না।

হ্যাঁ, আপনার কিছু জানার থাকে বলুন।

রমেন্দ্রবাবু বললেন।

মিস রায়ের এ রকম ভাবে উধাও হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের কিছু মনে হয় কি? যদিও আমাদের ধারণা, শুভেনবাবুর খুন হওয়ার সঙ্গে তাঁর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে।

মিঃ সেনের কথায় রমেন্দ্রবাবু বলেন—

আমার মনে হয় আপনাদের ধারণাই ঠিক।

কিন্তু অন্য কোন কারণ আপনাদের মনে হয় না?

না। সে রকম কিছু আমার মাথায় আসছে না।

মিসেস রায়?

সুষমা দেবী নীরবে মাথা নাড়েন।

দেখুন, আগেই ত বললাম, সব দিকটা ভেবে দেখতে হবে। ধরুন, মিস রায়ের উধাও হওয়ার সঙ্গে খুনের কোন ব্যাপার জড়িয়ে নাও থাকতে পারে। হয়ত—

অমিতাভ ভাবে মিঃ সেন অন্য কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন। তাই চুপ করে না থাকতে পেরে বলে ওঠে—

কিন্তু যে রকম অবস্থায় পাপিয়া তার জিনিষপত্র রেখে গেছে, সেটা কেউ তাকে গুম করেছে বলেই প্রমাণ দিচ্ছে মিঃ সেন।

মিঃ সেন তীক্ষ্ণ চোখে অমিতাভর দিকে চেয়ে বলেন—

খুব সত্যি। কিন্তু দুটো প্রবেবলটি দেখুন প্রথমে। এক নম্বর, শুভেনবাবুকে খুন করার পর মিস রায়কে কোন কারণে গুম করা হতে পারে। দু নম্বর, মিস রায়কে গুম করার জন্যেই শুভেনবাবুকে কেউ বা কারা খুন করেছে। আমরা যে কোকেনের প্যাকেট পেয়েছি, সেটা ঘটনাচক্রে বেড়িয়ে পড়েছে। অথবা কেউ কেসটা বিপথে চালাবার জন্যে এ রকম করেছে। কিন্তু তিন নম্বর, মিস রায়ের কথাটা বর্তমানের জিজ্ঞাস্য আমার।

অমিতাভ মিঃ সেনের যুক্তিতে চুপ করে থাকে।

মিঃ সেন বলে যান—সেইজন্যে দু নম্বর প্রবেবলটির স্বপক্ষে যদি কিছু পাই, সেটা অবশ্য জোরালো হওয়া চাই। তাহলে খুনীকে ধরাও সহজ হয়ে যাবে। আর দুটো ঘটনার কোন্‌টা কার জন্যে ঘটেছে, তা জানতে পারলে সবই সহজ হয়ে আসবে। তৃতীয়টির প্রয়োজন নেই। দেখা যাক, মিস রায় উদ্দেশ্যহীন হয়ে উধাও কেন হলেন? খুনের ব্যাপারটা যে রয়েছে।

কথাগুলো বলার পর একটু থামেন মিঃ সেন। আবার জিজ্ঞেস করেন—

আচ্ছা, এমন কারোর কথা আপনাদের মনে পড়ে যে লোকটির মিস রায়ের উপর দুর্বলতা ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আপনাদের পক্ষে সেটি সহ্য করা অসম্ভব ছিল।

না, সে রকম কোন ঘটনা ঘটেনি। রমেন্দ্রবাবু জবাব দেন।

মিস রায় কারো প্রপোজাল এক কথায় নাকচ করে দিয়েছেন, এমন কাউকে আপনারা জানেন?

না।

একটু ভেবে নিন।

না, এ রকম ঘটনা অন্তত আমাদের সামনে ঘটে নি বা শুনি নি। রমেন্দ্রবাবু চিন্তা করে নিয়ে জবাব দেন।

মিস রায়ের এসোসিয়েশন সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা আছে ?

মিঃ সেনের প্রশ্নের জবাবে রমেন্দ্রবাবু বললেন—

দেখুন, ওর যারা বন্ধুবান্ধব তাদের সবাইকে চিনি। আর লুকিয়ে কোন কিছু আমার মেয়ে করে না এটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে ওর ওপরে।

আচ্ছা, তাহলে সে রকম সন্দেহজনক কারো কথা আপনাদের মনে পড়ছে না।

না।

বাহাত্বর ট্রেতে চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। মিঃ সেন, রমেন্দ্রবাবু ও অমিতাভর হাতে চা'র কাপ ধরিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। মিঃ সেন ত্বু তিন চুমুক চা খেয়ে অমিতাভকে প্রশ্ন করেন—

আচ্ছা, অমিতাভবাবু, আপনার সঙ্গে মিস রায়ের আলাপ ক'দিনের ?

অমিতাভ প্রশ্নের আকস্মিকতায় একটু থমকে গিয়ে বলে—

বেশী দিনের নয়।

ও। আপনাদের আলাপ কি ভাবে হয় ?

হঠাৎ, ত্বর্যোগের মধ্যে।

আপনি কি করেন ?

কসট্ একাউণ্টেন্সীর ষ্টুডেণ্ট।

আপনাদের গাড়ী আছে ?

আমার নেই। তবে বাড়ীতে দাদার একটা গাড়ী আছে। কেন বলুন ত ?

প্রসঙ্গহীন প্রশ্নে কৌতূহলী হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

মিঃ সেন চা-টা এক চুমুকে শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখেন।

তাহলে হেল্পফুল ইন্‌ফরমেশন আপনাদের কাছ থেকে পেলাম না। আচ্ছা, এবার আমি উঠি।

বলে মিঃ সেন ফাইলটা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ান।

আচ্ছা, চললাম। অমিতাভবাবু, আপনাকে দরকার হলে যেন পাই।

নিশ্চয়।

মিঃ সেন ঘর থেকে বেড়িয়ে যান। কিছুক্ষণ আবার চুপ করে বসে থাকেন সবাই।

অমিতাভ বলে—আচ্ছা, আমি আজ তাহলে যাই।

এ্যাঁ, তুমি যাবে বলছ?

চমক ভেঙে রমেন্দ্রবাবু বলেন।

হ্যাঁ।

একটু থাক না। আমাদের অবস্থা ত বুঝতেই পারছ। তুমি থাকলে—

বিষণ্ণ স্বরে অমিতাভকে বলেন রমেন্দ্রবাবু।

অমিতাভ নীরব থাকে। একটু খুশীও হয় মনটা।

তুমি দুপুরে এখানেই খেও।

খুব ক্ষীণ ভগ্নস্বরে বলেন সুষমা দেবী।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

রমেন্দ্রবাবু সায় দিয়ে ওঠেন।

অমিতাভ একটু ভেবে নিয়ে বলে—

বাড়ীতে নিরাপদকে তাহলে টেলিফোন করে দিতে হবে।

সুষমা দেবী আস্তে আস্তে উঠে ক্লান্ত পায়ে ভেতরের দিকে চলে যান।

রমেন্দ্রবাবু অনেকটা আত্মগতভাবে অমিতাভকে লক্ষ্য করে বলেন—বড় আদরের মেয়েটা। কোথায় এখন কিভাবে আছে কে জানে।

রমেন্দ্রবাবুর কথাটা ঘরে যেন ভেসে বেড়ায় অজানা উত্তরের আশায়।

আবার বাগবাজারের উপকণ্ঠে শুভেনবাবুর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ান মিঃ সেন। শুভেনবাবুর বাড়ীটার সামনে একটি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পাড়াটায় বসতি একটু কম। শুভেনবাবুর বাড়ীর পাশে একটি মাত্র দোতলা বাড়ী আছে। আর সব বাড়ী একটু দূরে দূরে। বাকী অংশ ফাঁকা। স্থতরাং মিঃ সেন তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বাড়ীই দেখতে পান—যেটি কাছে রয়েছে।

সেই বাড়ীটার কাছে চার পাঁচটি ছেলে জটলা করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। এবং তাদের কথার মধ্যে উত্তেজনা আছে। মিঃ সেন তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আঁচ করে নিয়ে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে যান।

মিঃ সেনকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলেগুলি সব চুপ করে যায় এবং তাঁকে দেখতে থাকে।

মিঃ সেন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দোতলা বাড়ীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—

আচ্ছা ভাই, এ বাড়ীটাতে কারা থাকে বল ত ?

কালো রঙের হাফপ্যান্ট আর হলদে গেঞ্জী পরা ছেলেটা একটু এগিয়ে এসে বলে—আমরা থাকি।

আচ্ছা, আর কে থাকে ? না কি তোমরাই পুরো বাড়ীটাতে থাকো ?

আমরা একতলায় থাকি। আর বাড়ীওলা দোতলায় থাকেন।

হু। তোমার নাম কি ?

মৃদু হাসি নিয়ে মিঃ সেন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেন। তার অন্যান্য সাথীরা নির্বাক হয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে।

শ্রীমান তমাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঃ, সুন্দর নাম ত। আচ্ছা তমালভাই, এ বাড়ীটায় কাল কি হয়েছে বল ত?

মিঃ সেন শুভেনবাবুর একতলা বাড়ীটা দেখান।

ছেলেটি ছোট্ট একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলে—খুন।

কাল সারাদিন তুমি বোধহয় ছিলে?

বাড়ীতে।

প্রশ্নকর্তার বিবেচনাহীন প্রশ্নে বুঝি অবাক হয়েই জবাব দেয় তমাল।

বেড়োও নি?

না। সারাদিন বৃষ্টি পড়ছিল যে।

কালকে যে তোমাদের পাশের বাড়ীতে এ রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, তার তুমি কিছুই দেখ নি?

মিঃ সেন খুব সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করেন।

না ত।

কোন চীৎকার বা কথাও শোন নি?

না। মাথা সজোরে নাড়িয়ে জবাব দেয় তমাল।

কাউকে বিকেল বেলা ঢুকতে বা বেরুতে দেখেছ?

উঁহু। জানলাগুলো সব বন্ধ ছিল যে।

আচ্ছা। এবার একটু চোখ বুঁজে ভেবে বল ত, এই বাড়ীটার সামনে কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ কাল বিকেলে?

হ্যাঁ, একটা কালো রঙের গাড়ী দাঁড়িয়েছিল।

কি করে বুঝলে। তুমি-ই ত বললে একটু আগে জানলা টানলা বন্ধ ছিল।

তমাল একটু ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ।

তবে?

তখন বিকেল হয়ে গেছিল। খেলতে বেরুব বলে আমি খড়খড়িটা খুলে দেখছিলাম, বৃষ্টি থেমেছে কিনা?

তখন কটা ? তোমার মনে আছে ?

তখন সাড়ে তিনটে কি পৌনে চারটে হবে।

মিঃ সেন তমালের উত্তরে একটু উৎসাহের সঙ্গে যেন প্রশ্ন করেন—

তমালবাবু, তোমার কি রকম মনে আছে দেখি—সেই গাড়ীটার নম্বর কত ছিল ?

নম্বর। ডবলিউ, বি, সি, নয়টা শুধু মনে আছে—খুব ভাল করে ত দেখি নি।

আর কিছু মনে নেই ?

না। মনে করতে পারছি না।

কি গাড়ী ছিল ওটা ?

নাম ত জানি না।

কি রঙ ছিল গাড়াটার ?

কালো।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ীওলার নাম কি ?

শিবেন ঘোষ।

আর কে কে থাকেন ওনার সঙ্গে ?

একাই থাকেন।

ও। কোনদিক দিয়ে উপরে যাব বল ত ?

আমার সঙ্গে আসুন।

তমাল মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীটার দরজা পয্যন্ত গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে সিঁড়িটা দেখিয়ে দেয়।

মিঃ সেন তমালকে মৃদু হেসে বলেন—

ঠিক আছে। যাও এবার।

প্রশ্নোত্তরের হাত থেকে বাঁচতে পেরে তমাল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সে দৌড়ে তার অন্যান্য সাথীদের কাছে চলে যায়। মিঃ সেন বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দরজাটায় কড়া নাড়েন। বার দুয়েক কড়া নাড়বার পর দরজাটা হরাস করে খুলে যায়। ঝাঁটা হাতে বাড়ীর ঝি সামনে এসে দাঁড়ায়। সে মিঃ সেনকে করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কাকে চাই ?

শিবেন ঘোষ এখানে থাকেন ?

মিঃ সেন গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বলেন।

হ্যাঁ।

বাড়ীতে আছেন শিবেনবাবু ?

হ্যাঁ আছেন।

তাকে গিয়ে বল আমি পুলিশের লোক। তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ডেকে ১ আরও একটু নরম স্বরে যেন বলে এবার ঝি'টি। সে শিবেন ঘোষকে ডাকতে চলে যায়।

কিছুক্ষণ বাদে স্থূল চেহারার এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান। মিঃ সেন এক পলকে তার সর্বাঙ্গে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেন। ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর ত্রিশ। কালো গায়ের রঙ। চোখ দুটি ছোট ছোট। খুব বুদ্ধির আভাস তাতে নেই। কিন্তু ওকে দেখে সবকিছু বিচার করা যায় না। খাটো ধুতি লুঙ্গির মত করে পড়া।
গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী। মুখে পান চর্বন চলেছে।

একটা ঢোক গিলে নিয়ে পান-রস কলঙ্কিত দাঁত বার করে মিঃ সেনকে বললেন তিনি—নমস্কার।

নমস্কার। আমি পুলিশ থেকে আসছি।

মিঃ সেন তাঁর আইডেন্টেটি কার্ডটি বার করে দেখান। তারপর বলেন—

আপনিই ত শিবেন ঘোষ।

হ্যাঁ। ভেতরে এসে বসুন।

শিবেনবাবু মিঃ সেনকে ভিতরের ঘরে এনে বসান।

পুরানো আসবাবে ঘরটি ভরা। রুচির বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন পরিচয়ই ঘরটা দেয় না।

কি ব্যাপার বলুন ত?

শিবেনবাবু প্রশ্ন করেন মিঃ সেনকে।

আপনার পাশের বাড়ীর শুভেনবাবুর মার্ডারটার সম্বন্ধে আমি কতকগুলো কথা জানতে এসেছি।

কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কি বলতে পারি বলুন?

আপনি শুভেনবাবুকে চিনতেন? মানে তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল?

পাশাপাশি বাড়ী। আলাপ ত থাকবেই একটু।

তাম্বূল কলঙ্কিত দাঁত বার করে জবাব দেন শিবেনবাবু।

শুভেনবাবুকে কি রকম লোক বলে মনে হত আপনার?

আলাপ থাকলেও মানে এই ধরুন গিয়ে—ইয়ে—খুব থিক এণ্ড থিন ভাবে ত মিশি নি কোনদিন। তবে যতটুকু দেখেছি, তাতে বলতে পারি, হি ওয়াজ এ গুড ম্যান।

আপনি কাল কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন?

না, কিছু দেখি নি, বা শুনিও নি।

কালকে সারাদিন কি বাড়ীতেই ছিলেন?

যা বৃষ্টি পড়ছিল মশাই। আর যাবই বা কোথায়। সেই বিকেল পর্য্যন্ত—কিন্তু আমার মনে হয়—

কি?

খুব গোপনীয়ভাবে বলার মত ভঙ্গী করে মিঃ সেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন শিবেনবাবু—

আমার মনে হয় ঐ যে ভাগ্নে,—বুঝলেন না বিকাশ, বিকাশ। ওই এ কাণ্ডটা করেছে।

কি করে জানলেন?

তীক্ষ্ণ চোখে শিবেনবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন মিঃ সেন।

না, মানে, মনে হ'ল তাই বললাম।

কেন আপনার মনে হ'ল তাই জানতে চাইছি শিবেনবাবু।

ইয়ে—দেখুন—মানে—আমি—

আমতা আমতা করে শিবেনবাবু বলেন।

ঠিকমত জবাব দিন শিবেনবাবু।

কঠিন কণ্ঠে এবার মিঃ সেন বলে ওঠেন।

দেখুন, মানে কালই আপনাদের বলব ভাবছিলাম। কিন্তু—

আপনারা যখন কিছু দেখেন বা শোনেন, সেটা আপনারা কেন যে জানান না, তা বুঝতে পারি না।

বুঝতেই ত পারছেন, শান্তিপ্রিয় লোক আমি। সেইজন্যে হ্যাবাস হতে চাই না।

কিন্তু আপনার একটা কথায় দোষী যদি শাস্তি পায়—সব থেকে বড় কথা, যদি একটা সত্য ঘটনা আপনার কথায় বেড়িয়ে পড়ে—সেটা কি আপনি চাইবেন না।

নিশ্চয়ই চাইব।

তাহলে এবার বলুন।

আমাকে কিন্তু জড়াবেন না।

সে দেখা যাবে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা। বলুন এবার।

কাল বৃষ্টি পড়ছিল বলে —বুঝেছেন কিনা—সারাদিন বেরুতে পারি নি। সমস্তদিন শুয়ে থেকে ভালোও লাগছিল না। তাই একটু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম—তখন দেখলাম, শুভেনবাবুর বাড়ী থেকে—

এক মিনিট, তখন কটা বেজেছিল?

মিঃ সেন শিবেনবাবুর কথায় বাধা দিয়ে বলেন।

তখন সাড়ে তিনটে চারটে হবে—মেঘলা দিন ঠিক বুঝতেও পারিনি, আর ঘড়িও দেখি নি—তখন কি জানতাম—হ্যাঁ, তখন দেখি শুভেনবাবুর বাড়ী থেকে ইয়ে আর কি—

কে ?

ঐ বিকাশ। বেড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। দেখে মনে হয়েছিল কেমন যেন একটু—এই ধরুন এই—উত্তেজিত। তারপর শুনি শুভেনবাবু বিকেলে খুন হয়েছেন।

আপনি আমাদের জানিয়ে ভালো করলেন। আচ্ছা, তখন কোন গাড়ী দেখেছিলেন ? এই ধরুন কালো রঙের একটা গাড়ী। অথবা গাড়ীতে করে কেউ আপনাব কাছে কাল বিকেলে এসেছিলেন।

বিশ্বাস করুন, ঐ বিকাশকে ছাড়া আর কিছু দেখি নি। আর কালকে গাড়ী করে কেউ আমার কাছে আসেও নি।

মিঃ সেন তারপর জিজ্ঞাসা করেন—

আচ্ছা, বিকাশবাবু তখন কোনদিকে গেছিলেন ?

বড় রাস্তার দিকে।

তারপর কি উনি ফিরে এসেছিলেন আবার ?

তা দেখিনি। দেখবেন, আমাকে যেন ঝামেলায় জড়াবেন না। আমি যা জানি আপনাদের সুবিধার জন্য তা বললাম।

মিঃ সেন জবাব না দিয়ে ফাইল খুলে লিখতে ব্যস্ত হ'ন। লেখা শেষ হ'লে শিবেনবাবু অসন্তুষ্টির ছাপ মুখে নিয়ে সই করে দেন সেই কাগজটায়।

মিঃ সেন ফাইলটা বেঁধে নিয়ে উঠতে উঠতে বলেন—

অনেক ধন্যবাদ। চলি, নমস্কার।

নমস্কার।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসেন মিঃ সেন। তমালদের বাড়ীতে জিজ্ঞাসাবাদে আর কোন তথ্যই যোগ হয় না। কেউ কিছু দেখেন নি বা শোনেন নি। রাস্তায় বেরুতেই দেখা গেল তমালদের দল তখনও জটলা করছে। মিঃ সেনকে দেখে তারা কথা থামিয়ে চুপ করে যায়।

পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় পিছন থেকে তমালের গলা শুনতে পান মিঃ সেন।

কালকের সেই পুলিশের লোকটা।

মিঃ সেন শুনে নিজের মনে মৃদু হাসেন। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যান।

লালবাজারে এসে পৌঁছালেন মিঃ সেন। তখন অফিস পাড়াটায় পুরোদমে কর্মব্যস্ততা চলেছে। নানা বেসাতীর লোকের আনাগোনা সেখানে।

লালবাজার হেড কোয়ার্টারের গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পথে ডিউটিতে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ মিঃ সেনকে স্যালুট দেয়। মিঃ সেন স্যালুট গ্রহণ করে এগিয়ে যান তার গোয়েন্দা বিভাগের অফিসের দিকে।

পূজার ষষ্ঠী এগিয়ে এসেছে। অফিস পাড়ায় ব্যস্ততা। আগামী ছুটির আমেজে কোথাও বা ঢিমে তেতালায় কাজ চলে। কিন্তু কর্মব্যস্ততা জেগে থাকে পুলিশ দপ্তরে।

মিঃ সেন অফিস ঘরে ঢুকতেই সহকর্মী সুবিমল দে লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকান। মিঃ সেনকে দেখে বললেন—

হ্যালো, গুড মর্ণিং। কোন হোপফুল কিছু পেলি কি ?

মিঃ সেন নেতিবাচক ঘাড় নাড়েন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—

হ্যাঁ রে, কালকের মার্ডার কেসটার সম্বন্ধে ডাক্তারের রিপোর্ট এসেছে ?

এসেছে। সেটা ডি. সির কাছে। আর ডি. সি তুই আসলেই দেখা করতে বলেছেন।

সুবিমল ডি. সি-র অর্ডারটা জানাল মিঃ সেনকে।

যাচ্ছি।

মিঃ সেন তাঁর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে প্রাইভেট চেম্বারের দিকে এগিয়ে যান।

মে আই কাম ইন্ স্যার ?

সুভাষ রঞ্জন গুপ্ত—অফিসের পরিভাষায় ডি. সি, ডি. ডি—তাঁর কাগজ থেকে মুখ তুলে মিঃ সেনকে সুইংডোরের কাছে দেখে চোখের ইঙ্গিতে ঘরে আসতে বললেন।

মিঃ সেন ঘরে আসেন। মিঃ গুপ্ত বললেন—

সেন, কালকের মার্ডার কেসটার ব্যাপারে কোন ক্লু পেলে কি ?

আজকে স্যার জানতে পেরেছি যে, শুভেন রায়ের ভাগ্নে বিকাশকে কালকে বিকেলে সাড়ে তিনটে থেকে চারটে এই সময়টুকুর মধ্যে ঘটনাস্থল থেকে বেড়িয়ে আসতে দেখা গেছে।

রিয়েলি !

মিঃ গুপ্ত ডাক্তারের রিপোর্টের কাগজটা বার করে দেখেন, তারপর বলেন—

শুভেন রায়ের মৃত্যু ঘটেছে দেখা যাচ্ছে—ঐ সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। যাক, কথাটা তুমি কার কাছ থেকে জানলে ?

শুভেন রায়ের প্রতিবেশী শিবেন ঘোষের কাছ থেকে।

গোল্ড, আর কোকেনের মিষ্ট্রিটা কিছু ধরতে পারছ ?

গম্ভীরকণ্ঠে মিঃ সেনের কাছে জানতে চান ডি. সি. সুভাষ রঞ্জন গুপ্ত।

সে রকম কোন সন্দেহজনক লোকের লিষ্টে ত শুভেন রায়ের নাম পাই নি। তবে শুভেন রায়ের বড় ভাই এর মেয়ে মিস পাপিয়া রায়ের ডিসএপিয়ারেন্স—এই সবকিছু মিলে কেসটা বেশ কমপ্লিকেটেড হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ব্যাপারটার কোন হদিশ হল ?

না স্যার। তবে ডেসক্রিপশন আর ফটো সব পুলিশ ষ্টেশনে

চলে গেছে। মনে হচ্ছে স্যার, মিস রায় কিছু দেখে ফেলেছিলেন বা জেনে ফেলেছিলেন, তাই তাঁকে সরান হয়েছে।

তাই ত মনে হয়। আর এক্ষেত্রে দেখ—মিস রায়ের ডেথ আগে কিনা।

হতেও পারে। ঐ মিস রায়কে যেই গুম করুক, নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় নি। ট্যাক্সীতে রিস্ক্ আছে, তাতেও নেয় নি। তাই আমি খোঁজ নিয়েছি শুভেন রায়েব বাড়ীর সামনে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কোন গাড়ী দেখা গেছে কিনা? তাতে স্যার, তমাল বলে শুভেনবাবুর পাশের বাড়ীব একটা বাচ্চা ছেলে বলল যে, খেলা করতে বেরুবার জন্যে বৃষ্টি থেমেছে কিনা দেখার জন্যে সে খড়খড়ি ফাঁক করে যখন দেখছিল, তখন একটা কালো রঙের গাড়ীকে ঐ সময়টার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার।

মিঃ গুপ্তর কৌতূহলী উক্তির জবাবে মিঃ সেন আরো বলেন—আর গাড়ীটার নম্বর ডবলিউ. বি. সি. নয়; নয় টুকুই তার মনে আছে।

ইণ্টারেষ্টিং। শুধু নয় নয়, বাকি ছুটো সংখ্যা এক থেকে শূন্যর মধ্যে যে কোন একটা হতে পারে। দেখ, আমার মনে হয়, খুনীরা ঠিক করে আসে নি যে, তারা খুন করবে। কেন না, বাড়ীতে মিস রায়ের উপস্থিতি আর শম্ভু চাকরটার সিনেমা দেখতে যাওয়া ছুটোই আকস্মিক। সুতরাং তারা ওখানে গিয়ে এই সুযোগটা নিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান—মিস রায় যদি খুন হতে দেখে থাকেন, কোন চীৎকার করেন নি কেন? আর ওয়েদার কো-ইন্সিডেণ্টালী ফেব্যারেবল ছিল কাল।

আমি সেটাও ভাবছি স্যার, মিস রায় কোন চীৎকার করেন নি কেন? সাডেন শকে—না কি—

নো, ইটস্ এ কমপ্লিকেটেড কেস। যাই হোক, নাও এ রিপোর্টগুলো, এখন তোমার কাছে রাখ।

এইটের জন্যেই অফিসে এলাম স্যার।

টাইম অব ডেথ ত বললাম। মৃত্যুর কারণও জান। আর যে কর্ডটাতে ফাঁস দেওয়া হয়েছিল……আর ওয়াটার প্রুফটার ছেঁড়া অংশে এ্যালকোহল পার্টিকলস পাওয়া গেছে। তবু তুমি ভালো করে পড়ে দেখ রিপোর্টটা।

হ্যাঁ স্যার।

আর বিকাশ সম্বন্ধে কি ভাবছ ?

ওকে স্যার ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। বিকাশ কিছু করেও থাকতে পারে, কিম্বা নাও করে থাকতে পারে।

ঠিক আছে। তোমার এটা প্রথম কেস সেন, উইস ইউ গুডলাক।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

হ্যাঁ ভালো কথা, শুভেনবাবুর বেনিফেক্টর কারা হচ্ছে দেখেছ ?

সলিসিটর সৌরেন মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে ভালো ভাবে জেনে নেব স্যার।

ঠিক আছে।

আমি এখন যাচ্ছি স্যার।

মিঃ সেন ডি. সির ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন।

নিজের টেবিলে মিঃ সেন এসে বসে পড়ে হাতের রিপোর্টগুলো একটু ভালো করে দেখতে থাকেন। দেখা হয়ে গেলে মিঃ সেন ভাবেন—ওয়াটার প্রুফের ছেঁড়া অংশটায় এ্যালকোহল পার্টিকলস্ যখন পাওয়া গেছে, তখন লোকটির নেশা বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

ডি. সি বলেছেন, খুনী বা খুনীরা খালি বাড়ীর সুযোগই নিয়েছে। তারা বোধহয় একটা কথা জানতে পারে নি যে, মিস রায় ওখানে আছেন। সুতরাং কথার ছলে শুভেনবাবুকে ভেতরের ঘরে এনে

একজনের সাহায্যে অন্যজন খুন করে কর্ডটা দিয়ে। খুন তারা যখন হোক শুভেনবাবুকে করতই। নইলে কর্ডটা আনত না। তারপর মিস রায়কে দেখে গুম করার চিন্তা তাদের মনে আসে। সুতরাং, মিস রায়ের প্রাণের আশঙ্কাও রয়েছে।

কিন্তু কোকেন আর সোনার টুকরোগুলো শুভেনবাবুর কাছে ছিল কেন? তবে কি শুভেনবাবু বিরাট কোন স্মাগলার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? খোঁজ নিতে হবে খুব ভালো করে।

চিন্তাগুলো পাকিয়ে উঠতে থাকে মিঃ সেনের মাথায়, কিন্তু কোন কিছুর হদিশ পান না। বিকাশ সাড়ে তিনটে থেকে চারটের সময়ই বা শুভেন রায়ের বাড়ীতে কেন গেছিল?

বিকাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, উপরন্তু নজরও রাখতে হবে তার গতিবিধির ওপর।

নিতাই।

মিঃ সেন হাঁক দেন।

সাধারণ চেহারার একটি লোক ঘরে এসে ঢোকে মিঃ সেনের ডাকে। বলে—স্যার।

নিতাই, ১৮১ নম্বর যত্নবাবু লেনের বিকাশ ঘোষ বলে একটি লোকের উপর তোমাকে নজর রাখতে হবে। কখনও নজরের বাইরে যেতে দিও না। আর রামলোচনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। দুজনে পালা করে ডিউটি দেবে—বুঝেছ।

মিঃ সেন নিতাইকে তাঁর নির্দেশ দেন এবং নিতাই তার নোট বইতে নাম ঠিকানা লিখে বলে—ঠিক আছে স্যার।

আচ্ছা, বেড়িয়ে পর এখুনি।

পাপিয়া রায়ের খবর এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় নিয়ে গেল তাকে! মিঃ সেন উঠে পায়চারী করে চিন্তান্বিতভাবে।

সুবিমলবাবু বাইরে গেছিলেন। তিনি মিঃ সেনকে পায়চারা করতে দেখে বসতে বসতে বললেন—

কিরে, কি ভাবছিস অত?

ভাবছি মার্ডারটা কিসের জন্যে ঘটল? তাহলে একটু ব্যাপারটা ইজি হয়। তারপর, কে বা কারা করল?

অন্যমনস্কস্বরে জবাব দেন মিঃ সেন।

ও, কালকের কেসটা।

আচ্ছা, আমি একটু বেরুচ্ছি, বুঝলি।

মিঃ সেন কেস ফাইলটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন। প্রথমে সলিসিটর মুখার্জী, পার্ক লেন। তারপর বিকাশের যদুবাবু লেনের বাড়ীতে মিঃ সেনকে যেতে হবে।

লালবাজারের সামনে বাস ষ্টপটায় এসে দাঁড়ান মিঃ সেন।

সলিসিটর সৌরেন মুখার্জী। তাঁর হাতের কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বললেন—

হ্যাঁ, বলতে পারি। বাড়ীটা শুভেন রায়, তাঁর দিদি চারুদেবীকে দিয়ে গেছেন। ব্যাঙ্কের টাকার অর্দ্ধেক তাঁর নামে, আর বাকী অর্দ্ধেক মিস পাপিয়া রায়কে দিয়ে গেছেন। ইন্সিওরেন্সের টাকা সেবাশ্রম সঙ্ঘকে দান করে গেছেন। চারু দেবী বা পাপিয়া রায় তাঁদের অংশ কোন কারণে না নিলে বা এঁদের অবর্তমানে বিকাশ ঘোষের উপর অধিকার বর্তাবে।

আর ফ্যাক্টরী?

মিঃ সেন প্রশ্ন করেন।

সৌরীনবাবু চশমাটা মুছে নিয়ে পড়তে পড়তে বললেন—

ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে শুভেনবাবুর পুরোনো উইলটা রয়েছে, যদিও শুভেনবাবু সেটা পাল্টাবেন বলেছিলেন। যাই হোক, সেটা যখন হয়নি, সেই পুরোনো উইলই কার্যকরী হবে।

একটু থেমে আবার বললেন মিঃ সৌরেন মুখার্জী—উইল অনুযায়ী ফ্যাক্টরীর সমস্ত মালিকানা শুভেনবাবুর অংশীদার রূপেন বোসের উপর বর্ত্তাবে।

অদ্ভুত উইল! একটা উইল করেছিলেন ত শুভেনবাবু! কবে লেখা হয়েছিল উইলটা?

কারখানা তৈরীর প্রথম দিকে উইলটা করেছিলেন শুভেনবাবু—আর মাস দু'য়েক আগে বলেছিলেন কারখানা সম্বন্ধে উইলটা পাল্টাবেন। এবং সেই মত কাগজও ঠিক রাখতে বলেন—কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, উইলটা পাল্টান আর হয়ে ওঠে নি।

ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।

মিঃ সেন বাড়ীর বাইরে আসেন। এগিয়ে চলেন তাঁর সম্ভাব্য পথে।

বিকাশ ঘোষ এ বাড়ীতে থাকে?

হ্যাঁ।

আমি তাঁর সঙ্গে একট দেখা করতে চাই। আমি পুলিশ থেকে আসছি।

আইডেন্টিটি কার্ডটা মিঃ সেন দে ান।

তিনি ত এখন বাড়ী নেই।

আপনি তাঁর কে হ'ন?

বিকাশ আমার ছেলে।

কখন ফিরবেন বিকাশবাবু।

তা বলতে পারছি না। তবে কাল রাত্তির থেকে বাড়ী আসে নি।

চারু দেবী ভ্রাতৃশোক সামলে উঠতে এখনও পারেন নি, সেটি তাঁর চেহারায় পরিস্ফুট। কিন্তু বিকাশের বাড়ী না ফেরাটা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে নি, সেটা তাঁর গলার স্বর বুঝিয়ে দেয়।

মিঃ সেন বললেন—উনি কি মাঝে মাঝে বাইরে এ রকম থাকেন ?

হ্যাঁ। তবে পরের দিন আসে ঠিকই। আজও আসতে পারে।

আচ্ছা শুনুন, উনি বাড়ী ফিরে এলে অপেক্ষা করতে বলবেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসব।

মিঃ সেন চারু দেবীকে বললেন।

আচ্ছা।

বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে কিছুটা এগিয়ে একটা জায়গায় বসলেন মিঃ সেন। নিতাই তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

মিঃ সেন নিতাইকে বললেন—নিতাই, কিছু বলবে কি ?

হ্যাঁ স্যার। খোঁজখবর করে জানতে পেরেছি যে, বিকাশ ঘোষের কাছে কাল্লু আসে।

কাল্লু ?

হ্যাঁ স্যার।

কুখ্যাত কাল্লুর সঙ্গে বিকাশের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

মিঃ সেন চিন্তাসূত্র কেটে নিতাইকে প্রশ্ন করেন—আর কিছু খবর আছে ?

না স্যার, বিকাশবাবুর কতকগুলো বদ দোষ ছাড়া আর কিছু খবর বিশেষ নেই।

মিঃ সেন নিতাই-এর জবাব শুনে নিতাইকে বললেন—ঠিক আছে, এখন যাও। আর যদি বিশেষ খবর বলে মনে হয় এমন কিছু জানতে পার—আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

আচ্ছা স্যার।

মিঃ সেনকে অভিবাদন জানিয়ে নিতাই চলে যায়।

মিঃ সেন হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকেন—কাল্লুর সঙ্গে বিকাশের যোগ আছে। সুতরাং কাল্লু যদি বিকাশের সহকারী হয়—তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব। আর ছেঁড়া ওয়াটার প্রুফের অংশটা কাল্লুর

হতে পারে—বিকাশেরও হতে পারে। বিকাশের কোন স্মাগলার দলের সঙ্গে যোগ থাকতেও পারে। কাল্লু খুন এবং গুম ছুটোই করতে পারে। আর মিস রায়কে গুম করে কাল্লুর সাহায্যে মিস রায়কে যে কোন জায়গায় রাখা সম্ভব।

মিঃ সেনের চিন্তার জাল ছিঁড়ে হঠাৎ খেয়াল হয়, বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। এখন বিকাশের বাড়ীর দিকে যাওয়াই কর্তব্য।

আস্তে আস্তে বিকাশের বাড়ীতে পেঁাছান মিঃ সেন।

দরজায় এসে কড়া নাড়তে চারু দেবী এসে দরজা খুলে দেন।

বিকাশবাবু ফিরেছেন ?

না ত !

কিছু যদি মনে না করেন ভেতরে বসতে পারি ?

চারু দেবী যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললেন—নিশ্চয়। ভেতরে এসে বসুন না। বিকাশ এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হয়।

ধন্যবাদ।

একটি ঘরের ভিতর মিঃ সেনকে এনে দাঁড় করান চারু দেবী এবং জানান—

এটা বিকাশের ঘর। আপনি এখানেই বসুন।

মিঃ সেন ঘরটির চতুর্দিকে তাঁর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেন।

ঘরটি অগোছালো। একটা টেবিলে ছেঁড়া কাগজের মেলা। আর হু'একটি খবরের কাগজ আর ক্যালেণ্ডারের পাতার মলাট দেওয়া বই। ঘরের কোণে একটি কুঁজো। দেওয়াল আলমারীর কোণে উঁই পোকার ছোট্ট বাসস্থান। একটি আলনায় কতকগুলো জামা কাপড় অগোছালো অবস্থায় রয়েছে। এক ঝোণে একটি ছোট্ট খাট, সবুজ রঙের বেডকভারে ঢাকা। তার পাশে একটা ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশ।

টেবিলটার সামনের ঘরের একটি মাত্র চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন মিঃ সেন। চারু দেবী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে। কি করা কর্তব্য ঠিক করতে পারেন না তিনি।

মিঃ সেন চারু দেবীকে বললেন—আপনার যদি কোন কাজ থাকে ত' আপনি সেরে আসুন—একা আমার কোন অসুবিধা হবে না।

আচ্ছা।

চারু দেবী একটু স্বস্তিতে ঘর থেকে চলে যান।

টেবিলের উপর কাগজের স্তূপগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকেন মিঃ সেন। দেখতে দেখতে কয়েকটা রেস মাঠের বই বেড়িয়ে আসে। মিঃ সেন সেগুলোকে সরিয়ে রাখেন। কাগজগুলির কোণটার উপর যথেচ্ছ লেখা। সেই কাগজগুলির মাঝে হঠাৎ দেখেন কতকগুলো লেখা—একটু অদ্ভুত লাগে লেখাগুলো।

পাপিয়া রায়। শুভেন রায়। পাপিয়া রায়। শুভেন রায়। রমেন্দ্রমোহন রায়। কাল্লু। সুলতান—সুলতান। বেলা—বেলা।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেন মিঃ সেন। সুলতান আর বেলা কে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সুলতান। সুলতান আরেক কুখ্যাত গুণ্ডা। যার গুণ্ডা মহলে ওস্তাদ বলে পরিচয়। শেষ যেবার ধরা পড়ে—সেবার অনেকদিনের জেল হয়েছিল সুলতানের। জেল থেকে বেরোনর পর তার দুষ্কৃতির ছাপ অবশ্যই পাওয়া যায় নি। পুলিশের কাছে একদিন এসে বলেছিল—সে লাইন ছেড়ে দিয়েছে। বিলকুল পাল্টে গেছে। কিন্তু ওর নাম এখানে থাকাতে ব্যাপারটা কি রকম লাগছে। ও ত'—

বেলা। কোন মেয়ের নাম? এরই বা বিকাশের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক থাকতে পারে?

মিঃ সেন একটা বই-এর পাতা উল্টে খুঁজতে খুঁজতে একখানা কাগজ বই-এর পাতার ভাঁজ থেকে বার করেন।

মনে হলো, একটা চিঠি। কোন সম্বোধন নেই, কিন্তু শেষে বিকাশের নাম। তাতে লেখা আছে—

আপনার কথামত আমি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা হয় নাই। কিংবা আপনি দেখা করিতে রাজী ছিলেন না। যাহাই হউক, ইহা খুব ভালো লক্ষণ নয়।

আমার প্রয়োজন জানাইয়াছি। যথা বিহিত করিবেন। পুনর্বার বিফল করিলে ফলাফল যে খুব ভালো হইবে না তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইতি—

ভবদীয়
বিকাশ

'আমার প্রয়োজন' সেটা কি? বিফলে ফলাফল খারাপের কথা লিখেছে বিকাশ। কি করে সে? ব্ল্যাকমেইলিঙের কোন ব্যাপার নয় ত? কিন্তু কাকে এই চিঠিটা বিকাশ লিখেছে। প্রাপক কোথায় থাকে?

বিকাশ ত এখনও এল না।

চারু দেবীর কথায় চমক ভাঙে মিঃ সেনের। মিঃ সেন তাঁর হাত ঘড়িতে দেখেন বেলা তখন আড়াইটে।

আচ্ছা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম—পরে আবার আসব। অবশ্য রাত্রেই আসব। এর মধ্যে বিকাশবাবু যদি ফিরে আসেন, ওনাকে অবশ্যই বাড়ীতে থাকতে বলবেন।

আচ্ছা।

উনি রাত্রে কখন ফেরেন?

এই রাত দশটা কি সাড়ে দশটা। অবশ্য বাড়ী ফেরার মর্জি হলে। আর কি যে হবে এখন, শুভেন নেই—ছেলেটাও কপাল দোষে এমন হয়েছে। ভাগ্য, সবই ভাগ্য। নইলে এ দুর্ঘটনা ঘটবে কেন?

একটু ভারাক্রান্ত গলায় বললেন চারু দেবী।

দুর্ঘটনা ঘটলে এরকম অকস্মাৎই ঘটে থাকে—কি আর করবেন বলুন। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে দু'একটা কথা জেনে নিই।

বলুন।

শুভেনবাবুর মৃত্যু কার দ্বারা ঘটতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

মিঃ সেনের গুরুগম্ভীর প্রশ্নের উত্তরে চারু দেবী আস্তে আস্তে বললেন—আমি ঠিক জানি না। মানে বলতে পারছি না।

আচ্ছা, আপনি শুভেনবাবুর উইলের কথা জানেন?

হ্যাঁ।

যে কেউ আই মিন—পাপিয়া রায় বা আপনি অংশ না নিলে বা আপনাদের যে কোন একজনের অবর্তমানে তাঁর অংশটি বিকাশবাবুর হবে। তাই না?

চারু দেবীর মুখের রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকে—একটু থতমত খেয়ে যেন জবাব দেন তিনি—হ্যাঁ, মানে, ঐ রকমই কথা আছে।

মিঃ সেন চারু দেবীর সমস্ত মুখের পরিবর্তন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—

আচ্ছা, কালকে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিকাশবাবু কোথায় ছিলেন বলুন ত?

কেন বলুন ত? পাল্টা প্রশ্ন করেন চারু দেবী।

মিঃ সেন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—প্রশ্নটার জবাব দিন।

আমি—আমি ঠিক জানি না।

আচ্ছা, যা বলেছি আশা করি বলবেন বিকাশবাবুকে। আমি আবার আসব। নমস্কার।

কথা কটি বলে বিকাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন মিঃ সেন।

বাড়ীর বাইরে চারিদিকে তাকান মিঃ সেন। নিতাই-এর দল

ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত চিন্তিত পদক্ষেপে এগুতে থাকেন মিঃ সেন।

সুলতান—বেলা। তাদের নাম এই ঘটনার সঙ্গে কতখানি জড়িত? বিকাশের লেখা চিঠিটা কাকে লিখেছিল সে? ব্ল্যাকমেইল করছে কাউকে বিকাশ?

বসুন, বলুন এবার। রূপেনবাবু সোফাটিতে বসে মিঃ সেনকে আসন দেখিয়ে কথা কটি বললেন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

রূপেন বোস। শুভেন রায়ের কারখানার অন্যতম পার্টনার। রূপেনবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। মাথায় টাক। চোখ দুটি ঈষৎ অস্থির এবং তাঁকে অসুস্থ মনে হয়। হাত দুটি অল্প অল্প কাঁপে।

মিঃ সেন রূপেনবাবুকে বললেন—আমি এসেছিলাম, আপনার পার্টনার শুভেন রায়ের খুনের দু'চারটি কথা জানতে।

আমি সে ব্যাপারে কি বলতে পারি। উপরন্তু ও থাকে এক জায়গায়, আমি আরেক জায়গায়। কারখানা ছাড়া দেখাই হয় না বলতে গেলে।

একটু আস্তে আস্তে কথা বলেন রূপেনবাবু।

আচ্ছা শুভেনবাবুর শত্রু কে . পড়েছিলেন এমন লোককে জানেন?

না। ওর মত লোকের শত্রু হবে বিশ্বাস করা যায় না।

আচ্ছা, শুভেনবাবুর খুন হওয়ার দিন আপনি কোথায় ছিলেন? ধরুন বেলা তিনটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত।

কারখানায়। শুভেন যায় নি, তাই আমাকেই থাকতে হয়েছিল। রূপেনবাবু জবাব দেন একটু থেমে। কিন্তু আবার বলেন—আচ্ছা, শুভেনের ভাইঝি পাপিয়া রায়কে পাওয়া গেছে?

পাপিয়া রায় সম্বন্ধে আপনাকে কে বলল ?

আমি শুনলাম।

কার কাছে ?

মনে নেই।

কার কাছে শুনলেন মনে করে বলুন।

বিশ্বাস করুন, মনে নেই।

ভাবুন একটু।

না। কথা শুনলাম বলেছি, এর মধ্যে অন্যায় কোথায় ?

আপনি নেশা করেন কিছুর ?

মিঃ সেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কবলে প্রথমে রূপেনবাবু থতমত খেয়ে যান, কিন্তু সামলে নিয়ে খেপে গিয়ে মিঃ সেনকে বললেন—আমার ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। যা জানার আছে জিজ্ঞেস করুন।

আচ্ছা রূপেনবাবু, এখন কারখানার শুভেনবাবুর অংশটা কে পাবেন ?

আমি জানি না।

আশ্চর্য, উইলের খবর আপনি জানেন না। এটাও আশ্চর্য ব্যাপার। উইলটা শুনলাম ত পুরোনো।

একটু ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখে মিঃ সেন রূপেনবাবুর দিকে চেয়ে বলেন।

রূপেনবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করেন যেন। বলেন—হ্যাঁ, জানি।

কে পাবে অপর অংশটা ?

আমি।

হুঁ।

আপনি কি বলতে চাইছেন ?

আমি কিছুই বলতে চাইছি না। আচ্ছা, নমস্কার। আর শুনুন, আপনি আমাদের না জানিয়ে কোথাও যাবেন না।

কেন, আমার পার্সোনাল একটিভিটিস কি হবে সেটা বন্ধ করার কোন রাইট আপনার নেই।

সেটা যদি ভালো বোঝেন—আই মিন আপনার পার্সোনাল ব্যাপারটা, তাহলে আপনি আমি যা বললাম করবেন। আচ্ছা চলি।

মিঃ সেন জবাবের অপেক্ষা না রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। রূপেনবাবু মিস রায়ের খবর কার কাছে পেলেন? রূপেনবাবুর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে হবে ভালো করে, ঐ সময়টা কোথায় ছিলেন তিনি?

পরের দিন দুপুর তখন দেড়টা। বেশ গরম পড়েছে। লালবাজারে সেই ঘরটিতে মিঃ সেন বসে আছেন তাঁর টেবিলের সামনে।

বিকাশ কাল বাড়ী ফেরে নি। কোন খবরই নেই। ফেরার হয়েছে বোধহয়। রূপেন বোস শুভেনবাবুর খুন হওয়ার দিন তিনটে থেকে চারটে অবধি কারখানাতেও ছিলেন না। কোথায় ছিলেন?

জুতোর আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন ইনস্পেক্টর বাগচী এবং সোজা মিঃ সেনের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান তিনি।

মিঃ সেন মুখ তুলে চাইতে মিঃ বাগচী জিজ্ঞাসা করলেন—কি সেন, কেসটার কতদূর এগুলে?

প্রগ্রেস বলতে গেলে বিশেষ কিছুই হয় নি।

কি রকম?

মিঃ বাগচীর প্রশ্নে মিঃ সেন বললেন—বিকাশ ফেরার। শুভেনবাবুব মার্ডার হওয়ার রাত থেকে আজ পর্যন্ত ট্রেস নেই। আমি বিকাশের মা'র কাছ থেকে একটা ফটো চেয়ে এনেছি অবশ্য। আর সমস্ত ডেরাগুলি ওয়াচ রাখা হচ্ছে।

তারপর—

রূপেনবাবু···

মিঃ সেনের কথায় বাধা দিয়ে মিঃ বাগচী বললেন—রূপেনবাবু কে?

শুভেন রায়ের পার্টনার রূপেন বোস। ঘটনার দিন তিনি বললেন কারখানায় ছিলেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, তিনটে থেকে চারটে, বিকেলের এই সময়টুকু তিনি কারখানায় ছিলেন না। কোথায় গেছিলেন? পাপিয়া রায় সম্বন্ধে কার কাছে জানলেন? শুধু তাই নয়, নাম জানাচ্ছেন না, অথচ কার কাছ থেকে কথাটা শুনলেন।

ও, তা রূপেনবাবু কি—

রূপেনবাবু, শুভেনবাবুর মৃত্যুতে কারখানাটার মালিক হয়েছেন।

আচ্ছা। নেক্সট—

বিকাশ ঘটনার দিন সাড়ে তিনটে থেকে চারটের সময় ঘটনাস্থলে কি জন্য গিয়েছিল?

তারপর—

মিঃ সেন বললেন—কালো রঙের গাড়ী আর তার নম্বর—ডবলিউ, বি. সি. নয়···বাকী দুটো সংখ্যা জানা যায়নি। কোকেন কোত্থেকে এল? সোনা—সেটাই বা শুভেনবাবুর কাছে কেন?

হু, কেসটা মিস্ট্রি বটে।

আমার মনে হয় স্যার, বিকাশ কিছু জানে এবং এতখানি হয়ত জানে যে সব সমস্যা মিটাবার মত উপাদান তার কাছে রয়েছে।

মিঃ সেন একটু থেমে আবার বলেন—

বিকাশ একটা চিঠি লিখেছে। কিন্তু কাকে?'

মিঃ বাগচী কিছু না বলে চুপ করে থাকেন।

মিঃ সেন হঠাৎ বলেন—সুলতান। সুলতানের নাম বিকাশের কাছে পেয়েছি।

মিঃ সেন কাগজটি পকেট থেকে বার করে মিঃ বাগচীর হাতে দেন।

মিঃ বাগচী কাগজটি দেখতে থাকেন। তারপর বলেন—সেই নটোরিয়াস সুলতান ত মারা গেছে।

হ্যাঁ, মাস চারেক আগে। কিন্তু নামটা পাওয়া গেছে বিকাশের ঘরে। আর বেলাই বা কে?

আরো একটা খবর পেয়েছি বিকাশের সঙ্গে কাল্লুর যোগ রয়েছে।

আচ্ছা। ঐ বেলা না কি নাম বললে—বেলাই ত?

হ্যাঁ।

ওর খোঁজ পেলে কিছু?

না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম স্যার।

বল, বেশ জটিল কেসটা ত।

মিঃ বাগচী বললেন।

বিকাশ খুন না করে থাকলেও কিডন্যাপ করতে পারে। অবশ্য করুক আর নাই করুক, বিকাশ লোকটাকে ভীষণভাবে দরকার।

দেখ, আমি উঠি এখন। পরে আসব।

মিঃ বাগচী চলে যান।

সেইদিন রাত্রিবেলা। অমিতাভ ঘুরছে। পাপিয়ার খবর আজও পাওয়া যায় নি। অমিতাভ বিকাশের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু বিকাশের কোন খোঁজ মেলে নি।

অমিতাভর ধারণা, বিকাশই পাপিয়াকে গুম করেছে। তাই পাগলের মত খুঁজে চলেছে সে। কোথায় মিলবে তাকে, অমিতাভ নিজেও জানে না।

রমেন্দ্রবাবু যেন অনেক নির্জীব হয়ে পড়েছেন। আর মাঝে মাঝে অসহায় বোবা চাউনি মেলে বসে থাকেন সুষমা দেবী। এ দুদিন পাপিয়া কোথায় আছে, এরকম কিছুমাত্র ধারণা না নিয়েই খুঁজে বেড়িয়েছে যুক্তিহীনভাবে। বিকাশকেও চোখে পড়েনি।

মাথার মধ্যে একটা চক্র যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে আওয়াজ তোলে, বোঁ বোঁ বোঁ।

ক্লান্ত পায়ে অমিতাভ হেঁটে চলেছিল—সেই যুক্তিহীন ঘোরা। অমিতাভ চারিদিকে চেয়ে চেয়ে চলছিল। তখন রাত সাড়ে সাতটা। লোকজন রাস্তাতে চলাচল করছে মন্দ নয়। দোকানগুলো তাদের পসরা গুটিয়ে নিয়েছে বা নিচ্ছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে অমিতাভ। শিরায় চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার আভাষ দিতে থাকে। দৃষ্টিটাকে আরেকটু তীক্ষ্ণ করে ভালো করে দেখে অমিতাভ।

হ্যাঁ, বিকাশইত। একবার দর্শনে তার চেহারা স্পষ্ট মনে আছে অমিতাভর। আজ আর ওকে ছাড়বে না অমিতাভ। ও পাশের ফুটপাথ ধরে বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বিকাশ। বিকাশের সঙ্গে দূরত্ব রেখে তার পেছনে পেছনে অমিতাভও চলে।

বিকাশ চলতে চলতে থেমে যায় একটু। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার সে। অমিতাভকে দেখে ফেলে নি ত' বিকাশ।

না। আবার দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলতে থাকে বিকাশ। অমিতাভ তার পেছনে সমান তালে তাল মিলিয়ে পা চালায়।

সোজা রাস্তা ধরে এগুতে এগুতে ডানদিকের একটি রাস্তা ধরে বিকাশ। অমিতাভর মনে এক কথা, আজ ওর আস্তানা দেখব, তাহলেই অনেক কাজ হবে।

পথটা নির্জন থেকে নির্জনতর হয়। আধো অন্ধকারে লোক বিরল রাস্তাটা। পিছন পিছন চলে অমিতাভ।

উঃ। কোন মাথা তোলা ইঁটে বুঝি হোঁচট খায় অমিতাভ। ব্যথাটা সামলে নিয়ে মুখ তুলে বিকাশকে খোঁজে।

বিকাশ নেই। কোথায় গেল? হাওয়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি? কোন দিকে গেল?

ধমনীর রক্তপ্রবাহ দ্রুত হয়ে এসেছে রোমাঞ্চে, সেটা অনুভব করতে পারে অমিতাভ। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেটি একটি কুখ্যাত পাড়া। রাহাজানি, জখম, গুণ্ডামি, অনেক কিছুই ঘটে। রাত যত জমে আসে, ঘুম ভাঙে এই পল্লীর।

আস্তে আস্তে এগোতে থাকে অমিতাভ চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে। প্রায়ান্ধকার রাস্তা, দৃষ্টি অনেকাংশেই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। হঠাৎ একটা বৈদ্যুতিক আলোড়ন শিরায়, উপশিরায়, মাথায়। সমস্ত রক্ত যেন চলকে ওঠে ভীষণ চমকানীর বেগে।

হতচকিত ভাবের মধ্যে একটা হাত শক্ত করে অমিতাভ ধরে টেনে নেয়। ভালো করে চেয়ে দেখে অমিতাভ,—বিকাশ।

কর্কশ স্বরে বিকাশ প্রশ্ন করে—তুই কে? আমার পিছু নিয়েছিস কেন? তুই কি পুলিশের লোক।

নিজেকে একটু সংযত করে বলে অমিতাভ—না।

তবে?

তোমার আস্তানার খবর আমার দরকার।

বেপরোয়া ভাবে অমিতাভও জবাব দেয়।

কেন? আমার আস্তানায় কি প্রয়োজন?

বিকাশের শ্লেষ কণ্ঠে প্রশ্ন ঝরে পড়ে সেই অন্ধকারে।

পাপিয়াকে কোথায় রেখেছ?

পাপিয়াকে—

থেমে যায় বিকাশ। অমিতাভর মুখের কাছে মুখ এনে ভালো করে দেখে, তারপর বলে—

ও হোঃ, তুমি অমিতাভ, তাই না?

হ্যাঁ। বল এবার, পাপিয়াকে কোথায় রেখেছ?

এক কথায় বলে দেব তোমায়, হ্যাঃ। তাই যদি বলে দেব, তাহলে আমি এত কষ্ট করব কেন? হুঁঃ। খুঁজেও পাবে না তাকে।

তোমাকে যখন একবার পেয়েছি—

বিকাশ অমিতাভকে বাধা দিয়ে বিদ্রুপ করে বলে ওঠে—

আমাকে পেয়েছ বলেই তুমি জেনে ফেলবে সব। তোমাকে একটা কথা বলি শোন, আমার পেছনে ঘোরার চেষ্টা করো না। ভালো হবে না।

বিকাশ কর্কশ কণ্ঠে শেষের দিকটা ভয় দেখায়।

আমি বাচ্ছা ছেলে নই, বুঝেছ।

অমিতাভর বেপরোয়া জবাব বিকাশকে যেন ঘৃতাহুতি দেয়। সে ক্রুর কণ্ঠে বলে—তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। একটা খুন আমার ঘাড়ে ঝুলছে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও একেবারে খতম করে দেব। এখন যাও এখান থেকে।

ভয়টা অন্য কাউকে দেখিও। আমি যাব না।

তোমাকে ভালভাবে বলছি, যাও এখান থেকে।

পাপিয়াকে ছেড়ে দাও, না হ'লে বল, কোথায় আছে সে?

সেটা আমার ইচ্ছে—বলতে গিয়ে আবার থেমে যায় বিকাশ। ক্রুদ্ধস্বরে একটু জোরেই বলে ওঠে—বিপদে পড়বে। যাবে কিনা?

অমিতাভও দৃঢ়স্বরে বলে—আমার কথার উত্তর পাই নি।

হঠাৎ একটা আঘাত লাগে অমিতাভর মুখে। চোখটায় মুহূর্তের জন্যে ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আঘাতের প্রচণ্ডতা থেকে আস্তে আস্তে সামলে নিতে থাকে অমিতাভ। ঠোঁটটা কেটে গেছে বলে মনে হয়।

ঘুষির পাল্টা জবাব দেবার জন্যে মুখ তুলে চেয়ে দেখে সে, বিকাশ নেই। চারিদিকে তাকায় কিন্তু বিকাশের চিহ্ন নেই কোথাও।

আর এরপর এ অঞ্চলে কোথাও ঢুকে যাওয়া বিকাশকে অমিতাভর পক্ষে খুঁজে বার করা অসম্ভব। আস্তে আস্তে সে বড় রাস্তার দিকে চলতে থাকে।

বিকাশ তাহলে পাপিয়াকে সরিয়েছে। পাপিয়াকে উদ্ধার করতে এখন মিঃ সেনের সাহায্যের প্রয়োজন ।

লালবাজারের উদ্দেশ্যে অমিতাভ চলতে থাকে।

মিঃ সেন তখন অফিসেই ছিলেন। অমিতাভ মিঃ সেনকে তার বিকাশের সঙ্গের ঘটনা বলে।

'মিঃ সেন বললেন—ভেরী ড্রামাটিক্যাল এনকাউনটার।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। বিকাশকে ফলো করতে করতে আর কথা বলতে বলতে এ কথাটাই মনে হচ্ছিল।

মুখের আঘাতের স্থানটায় হাত বুলিয়ে বলে অমিতাভ।

আচ্ছা, আপনাকে তাহ'লে ঠিকানা বলেছে? ওর ঘাড়ে একটা খুন ঝুলছে! আশ্চর্য!

মিঃ সেন অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ। আর পাপিয়াকেও ওই সরিয়েছে। মিঃ সেন, একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। নইলে আবার কোথায় সরিয়ে দেবে।

মিঃ সেন একটু ভেবে বলেন—হ্যাঁ। সরিয়ে ও দিতে পারে। লোকটা আপনাকে পুলিশের লোক ভেবেছিল প্রথমে। তারপর সুবিধামত জায়গায় ধরে বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা ধরিবাজ সে। যাক, তবু আমি ঐ লোকালিটির নটোরিয়াস স্পটগুলো দেখছি রেইড করে। বিকাশকে পাওয়া গেলে হয়? ওকে আমাদের দরকার। আর মিস রায়কে নিশ্চয় বার করতে কষ্ট হবে না। বিকাশকে ধরার জন্যে ওয়ারেন্ট পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে।

আচ্ছা, এবার আমি তাহলে বাড়ী যাই।

হ্যাঁ। আমি দেখছি এ দিকটা। মিস রায়কে পাওয়া গেলে খবর পাবেন।

মিঃ সেন টেলিফোনটা তুলে নেন।

বাড়ীতে এসে মুখ হাত ধুয়ে চুপ করে বসে থাকে অমিতাভ। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে সারে বারোটার ঘরে আসে।

মিঃ সেনকে টেলিফোন করে অমিতাভ। মিঃ সেন ক্লান্ত কণ্ঠে জানান—না, কোন ট্রেসই পাওয়া যায় নি কারুর।

মেরা চানা বানা হ্যায় ট্যার,
মেরা চানা বানা হ্যায় ট্যার,
খাতে বড়ে বড়ে অফসর
কলক ঘিচতে সরাসর
বইঠতে কুরসীকোপর
চানাচুর গরম।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে নিয়মানুযায়ী। তারপর রাত্রিও এসেছে তার অন্ধকারের আঁচল দুলিয়ে। হলদে আলোর টিনের চালের ঘরটার পাশ দিয়ে একটা চানাচুরওয়ালা তার সাদা জামা কাপড় আর টুপি পড়ে সুর করে বলতে বলতে চলেছে। পিছনের বস্তীঘরগুলোয় কেউ গান গাইছে, কেউবা ঝগড়ায় মত্ত। বাতি নিভিয়ে অন্ধকার দাওয়ার উপর কেউ বা বসে কথা বলছে—নানা কথা।

এরই মাঝে কাল্লুর দরমা দেওয়া ঘর। কুপী জ্বলছে। সোঁদা গন্ধের মাটির মেঝেয় ছেঁড়া মাদুরটার উপর বিকাশ বসেছিল।

বিকাশ কাল্লুকে বললে—

এবার আমি বেরুব কাল্লু।

এখোন বেরুচ্ছেন? জরুরী দোরকার আচে?

হ্যাঁ, যেতেই হবে।

কাল্লুর ভাঙা হেঁড়ে গলার প্রশ্নের জবাব দেয় বিকাশ।

সাওধানে যান। পুলিশ ত জোর ঢুঁরছে। এখানে পুলিশ হামলা করলে আপনাকে হাওয়া করে দিতে টেইম লাগবে না। কিন্তু বাইরে ভালো করে দেখবেন।

কাল্লু আবার হেঁড়ে গলাকে যথাসম্ভব নামিয়ে বলে।

পেছন দিয়েই যাব। আর আমার চোখটা বড় ভালো, মাথাটাও মন্দ নয়। বিকাশ কাল্লুকে আশ্বস্ত করে যেন বলে।

হাঁ শুনেন, রূপেয়ার বন্দোবস্ত কোরেন এবার।

করব। মোটা টাকাই পাবি। কাজটা হাঁসিল হোক।

দরমার দেওয়ালের একটা অংশের দড়ির বাঁধন পাল্লার মত খুলে দেয়। তারপর সেটা দিয়ে বিকাশ বাইরে চলে যেতেই কাল্লু ভেতর থেকে আবার বেঁধে দেয়। আবার সেটা দেওয়াল হয়ে যায়। নিরীহ দরমার দেওয়াল।

মেরা চানা বানা হ্যায় দানেকা
মেরা চানা বানা হ্যায় দানেকা
দিন ভর দেখ মজা খানে কা
মোকা ফিঃ. না মিলে আনেকা
রাস্তা খুলা হ্যায় যানেকা
চানাচুর গরম।

বিকাশের সন্তর্পিত পদক্ষেপ হঠাৎ যেন একটু থমকে যায় চানাচুর ওয়ালার সুর করা কথাগুলিতে। এক বালক পিছনে তাকিয়ে বুঝতে পারে চানাচুরওয়ালার সাদা কোপনের আড়ালে চানাচুর নেই। বিকাশের শ্যেনচক্ষু বুঝে নেয় পুলিশের লোকটিকে।

বিকাশ ভাবে, না, দুটো দিনই খারাপ গেল। কাল অমিতাভ পিছু নিল। আজ আবার চানাচুরওয়ালার খোলসে পুলিশ। না, একটু অসাবধান হয়েছে বোধহয়।

চানাচুরওয়ালা নিস্পৃহভাবে এগুতে থাকে। কোন উদ্বিগ্নতার ছাপ নেই। বিকাশ একটু পরীক্ষা করতে চলার গতি দ্রুত করে দেয়। কিন্তু একই দুরত্ব যেন থেকে যায় চানাচুরওয়ালা ও বিকাশের মধ্যে।

বিকাশ ফন্দী আঁটে। কিভাবে এড়ান যায় একে। পুলিশ চিনেজেঁাকের মত লেগে আছে।

মাথায় তার বুদ্ধিও খেলে যায়। হ্যাঁ। সামনে একটা বাড়ী আছে, তার দুটো গেট। বড় রাস্তার উপর একটা, আরেকটি পেছন দিকে—ছোট একটি রাস্তায় এসে পরেছে। সুতরাং, ঐ বড় রাস্তার উপরকার গেটটা কাজে লাগালে ফেউটাকে ঝেড়ে ফেলা যায়।

রাস্তার উপর একটা দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বিকাশ। শো-কেসটার ফালি আয়নাটায় দেখে, চানাচুরওয়ালা প্রায় অদৃশ্য ইঙ্গিত করে আরেক জনকে।

দ্রুত সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় বিকাশ। লক্ষ্য তার সেই দুই গেটওয়ালা বাড়ী। চানাচুরওয়ালাও তার গতি বাড়ায়। গলায় সুর করে বলে—

রাস্তা খুলা হায় যানে কা
চানাচুর গরম।

হ্যাঁ। বিকাশের এড়িয়ে চলে যাওয়ার রাস্তা খোলাই আছে। মনে মনে হাসে বিকাশ।

বাড়ীটার সামনে পেঁছায় বিকাশ। যতদূর সম্ভব সাধারণ ও নির্বিকার ভঙ্গীতে ঢোকে গেটটা দিয়ে। একটু ভেতরে পা দিয়েই বিকাশ ছুটতে থাকে আরেকটি গেটের উদ্দেশ্যে। এক ভদ্রলোক দরজা দিয়ে বেরিয়েই বিকাশকে ও রকম ভাবে ছুটতে দেখে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

আরেক রাস্তায় পড়ে বেশ খানিকটা রাস্তা ছুটে যায় বিকাশ। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করে। বিকাশ মুখটা মুছে নেয়। মুখে চাপা হাসি খেলে যায়।

ওদিকে চানাচুরওয়ালা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ায়। গেট দিয়ে কিছুদূর ঢুকে আরেকটি গেট দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে চলতে থাকে চানাচুরওয়ালা বা নিতাই।

বিকাশ নিতাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ নিতাই সেই বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কর্তব্য স্থির করে নিয়ে আস্তে আস্তে স্থানীয় থানার দিকে পা চালায়। কারণ বিকাশের চোখে ধূলো দেওয়ার খবরটা লালবাজারে জানিয়ে, এরপর করণীয় কর্তব্য কি সেটা জেনে নেওয়া। স্থানীয় থানা থেকে টেলিফোনে সেটা সেরে নেওয়া যাবে।

থানায় পেঁৗছে ওখানকার অফিসার-ইনচার্জের ঘরে ঢোকে নিতাই এবং অভিবাদন জানায়। অফিসার-ইনচার্জ নিতাই-এর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—কি চাই?

নিতাই পকেট থেকে ে র আইডেন্টিটি কার্ডটা বার করে তাঁকে দেখায়।

অফিসার-ইনচার্জ কার্ডটির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে, গম্ভীর গলায় আবার প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার?

নিতাই সসম্ভ্রমে বলে—একটা ফোন করব স্যার ডিপার্টমেন্টে। ওখানকারই কাজে স্যার।

অফিসার-ইনচার্জের সম্মতি পেয়ে নিতাই টেলিফোন তুলে লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

লালবাজারে টেলিফোন বাজতেই মিঃ সেন টেলিফোন তুলে ধরেন—হ্যালো!

হ্যালো। স্যার, আমি নিতাই কথা বলছি।

নিতাই-এর নাম শুনে মিঃ সেন উৎসুক কণ্ঠে বলে ওঠেন—আমি এস. আই. সেন কথা বলছি। কি খবর আছে বল!

নিতাই একটু আমতা আমতা করে বলে—স্যার, বিকাশের পিছনে ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।

কিন্তু স্যার, একটা বাড়ীর সামনে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেছে।

তোমাদের চোখের উপর একটা লোক পালায় কি করে? খোঁজ ভালো করে। যেখান থেকে পালিয়েছে সেই পোষ্টে লোক রাখ। আর, বাড়ীটার ভিতর খোঁজ নাও শীগগির।

মিঃ সেনের কণ্ঠে বিরক্তির আভাষ ফুটে উঠে।

ঠিক আছে স্যার। কিন্তু ঐ বাড়ীর ভিতর পাওয়া যাবে বলে ত মনে হয় না।

নিতাই এর কথায় মিঃ সেন প্রশ্ন করেন—কেন?

কারণ স্যার, বাড়ীটার দুটো গেট। একটা বড় রাস্তার উপরে, আরেকটা গেট পিছনের রাস্তায়, স্যার।

তাহলে ত পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এক গেট দিয়ে ঢুকে আরেক গেট দিয়ে পালিয়েছে। তবুও খোঁজ নাও। দুদিকেই লোক রাখ।

আচ্ছা স্যার।

একটু থেমে নিতাই আবার বলে—লোকটা স্যার বড় ধরিবাজ। আমাকে ঠিক চিনে ফেলেছিল।

ঠিক আছে। আর শোন, বিকাশকে কোথা থেকে ফলো করেছিলে।

কাল্লুর বস্তি বাড়ী থেকে স্যার। আপনার কথামত কাল্লুর উপর নজর রাখতে বিকাশকে পেয়ে গেছিলাম।

ও, ঠিক আছে। তুমি ও. সি. কে. টেলিফোনটা দাও।

আচ্ছা স্যার।

নিতাই অফিসার-ইনচার্জকে মিঃ সেনের কথা জানাতে, তিনি টেলিফোন ধরলেন—হ্যালো।

স্যার, আমি এস. আই. সেন কথা বলছি।

হ্যাঁ, বলুন।

স্যার, কাল্লুর বস্তিটা ত আপনার এলাকাতে পড়ে?

কাল্লু? মানে—ওহো বুঝেছি। কোন কাল্লুর কথা বলছেন? হ্যাঁ, ওটা আমার এলাকার মধ্যে রয়েছে।

তাহলে কাল্লুকে পাকড়াও ক'রে লালবাজারে এখুনি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। ওকে একটা কেসের ব্যাপারে প্রয়োজন।

অল রাইট। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

মিঃ সেনের কথা শেষ হ'লে অফিসার-ইনচার্জ ভদ্রলোক নিতাই-এর হাতে টেলিফোনটা দেন। নিতাই মিঃ সেনের কাছে আরও কিছু উদ্দেশ্যের আশায় বলে—স্যার, আমার এখন কিছু করার আছে?

না, কাল্লুকে ধরে আনতে ও সিকে বলেছি। তুমি চলে এস।

আচ্ছা স্যার।

টেলিফোনটা রেখে দেয় নিতাই।

এর মধ্যে অফিসার-ইনচার্জের কলিংবেলের আওয়াজে একজন পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর নির্দেশে পুলিশটি একজন এ্যাসিস্টেণ্ট সাব-ইনস্পেক্টরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অফিসার-ইন-চার্জ এ্যাসিস্টেণ্ট সাব-ইনস্পেক্টরকে কাল্লুর সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে দেন।

পুলিশের গাড়ী বেরিয়ে পড়ে থানা থেকে।

পুলিশের দল কাল্লুর আস্তানায় এসে পেঁছায়। সে জায়গায় যেন হঠাৎ সতর্কতা বেড়ে যায়। হলদেটে বালব জ্বলা দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি এবং পানওয়ালা বিস্মিত-ভীত দৃষ্টিতে চায়। বস্তিটার প্রবেশ পথের মুখে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার ঢেউ যেন লাগে সমস্ত

পরিবেশে। আধো অন্ধকারে মানুষগুলো আশঙ্কায় চেয়ে থাকে।

গাড়ী থেকে নেবে পুলিশের দল ঢোকে বস্তির ভিতর। দু'পাশের ঘরগুলো থেকে লোকগুলো কৌতূহলে দেখে তাদের। কেউ কেউ যেন পুলিশের পিছনে আকণ্ঠ জিজ্ঞাসা নিয়ে এসে ভীড় করে।

কাল্লুর ঘরের সামনে এসে পুলিশের দল থেমে যায়। তাদের আগমনের সঙ্কেত যেন সেখানেও পেঁীছেছিল। কিন্তু এ্যাসিট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর সেটি যেন বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলেন এবং থমকে যাওয়া কাল্লুকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—কাল্লু, পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। চল্।

কিন্তু স্যার হামি কি করলাম!

সেটা লালবাজারে গেলেই বুঝতে পারবি। এখন গাড়ীতে গিয়ে ওঠ।

তা-হামি—শেষবারের মত কিছু বলতে গিয়ে কাল্লু থেমে যায় ক যেন ভেবে। তারপর নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিয়ে বলে—চলেন।

কাল্লু পুলিশের গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসে।

লালবাজারে সেই একই ঘরে মিঃ সেন ও মিঃ বাগচী বসে কথা বলছিলেন। বেশি পাওয়ারের আলো জ্বলছে ঘরটাতে। নিতাই কাল্লুকে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

মিঃ সেন ও মিঃ বাগচী মুখ তুলে তাদের দিকে চাইতেই, নিতাই জানায়—স্যার, কাল্লুকে নিয়ে এসেছি।

মিঃ সেন কাল্লুর কর্কশ মুখখানার দিকে গম্ভীরভাবে চেয়ে দেখেন।

সার, হামি কি কোরলাম।

কাল্লু তার ভাঙা বাংলা ভাষায় যথাসম্ভব স্বর নরম করে বলে।

মিঃ সেন গম্ভীরভাবে জবাব দেন—কি করেছ না করেছ সেটা পরে হবে। আগে আমার কথার পরিষ্কার এবং সত্যি জবাব দাও।

বোলেন।

বিকাশ ঘোষকে চেন?

কৌন বিকাশ ঘোষ সার?

আমি কোন লোকের কথা বলছি তুমি ঠিকই বুঝেছ। বেশি কথা না বাড়িয়ে জবাব দাও। ধমকের সুরে বলেন মিঃ সেন।

হামি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাজে কথা বলো না। তোমার চেনা বিকাশ ঘোষ একটাই আছে—সেটা আমরা ভালো করে জানি।

ও বিকাশবাবু—হ্যাঁ সার, চিনি।

যেন বাধ্য হয়েই জবাব দিতে হয় কাল্লুকে।

তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কি জন্যে?

উনি হামাকে ভালোবাসেন তাই—

বিদ্রূপভরা কণ্ঠে মিঃ সেন বলে ওঠেন—বাঃ। ভালোবাসে যাকে, আর ভালোবাসছে যে—দুজনেই সমান দেখছি। কি বল?

কাল্লু বুঝতে না পেরে নির্বাকভাবে মিঃ সেনের দিকে চেয়ে থাকে।

আচ্ছা কাল্লু, শুভেনবাবুকে চেন?

উনার মানি বিকাশবাবুর মামা?

হ্যাঁ।

হামার মত লোকের সঙ্গে উনার আলাপ কেনো থাককে বোলেন।

মিঃ সেন একটু ভেবে নিয়ে প্রশ্ন করেন—শুভেনবাবু খুন হয়েছে জান ত?

জী, বিকাশবাবুর কাছে জেনেছি।

হঠাৎ মিঃ সেন ঝপ করে প্রশ্ন করেন—শুভেনবাবু খুন হওয়ার

দিন বিকাল সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে বিকাশবাবু আর তোমাকে কেন দেখা গেছিল সেখানে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাল্লুর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন মিঃ সেন। কাল্লুর মুখখানা কথাটা শুনে হঠাৎ যেন পাংশু হয়ে আসে। সে বলে—হামি সাব খুনের কুচ্ছু জানি না। বিকাশবাবু যেতে বলেছিল তাই গিছলাম। কিন্তু সাব, বাড়ীর থেকে অনেকদূরে ছিলাম। বিকাশবাবু গেলেন, তারপর তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে ঐ খুনের ব্যাপারটা জানান সাব।

মিঃ সেন ও মিঃ বাগচী দৃষ্টি বিনিময় করে নেন। মিঃ সেন শুধু আন্দাজের উপর প্রশ্নটি করেছিলেন। সেটি যে যুৎসই হয়ে যাবে বুঝতেই পারেন নি।

মিঃ সেন আবার প্রশ্ন করেন—কেন গেছিলে ?

বিকাশবাবু বলল কুছু টাকা মামার কাছ থেকে পাবে—তাই—

বিকাশবাবু শুভেনবাবুর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে কিছু বলেছিল ?

উনি বললেন—মামাবাবু খুন হয়েছেন। আর কে করেছে তা বিকাশবাবু জানে।

কোন নাম বলেছিল ?

না সাব।

ঠিক করে বল। নইলে খুনের জন্য ফাঁসীর দড়ি তোমার গলায় ঝুলবে।

সাচ বলছি সাব। আপনি বিশোয়াস করেন।

ঠিক করে জবাব দাও।

সাচ বলছি সাব, কোন নাম বোলেন নি।

বিকাশবাবু তোমার সঙ্গে কবে থেকে আছে ?

হামার কাছে থাকে না সাব। ঐ চীৎপুরে একটা ডেরায় থাকে।

হুঁ। আচ্ছা, আজ এখন কোথায় গেছে বল ত ?

হামি জানি না সাব।

বল শিগ্‌গির।

কঠিন গলায় আবার আদেশ করেন মিঃ সেন।

সাচ বলছি সাব।

তোমার কাছ থেকে পরামর্শ করে গেল, অথচ তুমি জান না!

আজ কুছু রূপেয়া দরকার। বিকাশবাবুকে বলতে—বলল—আজ দিবে। এই কথা হয়েছিল।

কেন? টাকা তোমাকে দেবে কেন?

মানে সাব—

মামা নেই, টাকা বিকাশবাবু কোথা থেকে পাবেন?

জানি না সাব।

ঠিক।

দিব্বি করে বলছি সাব।

আচ্ছা কাল্লু, সুলতান আর বেলার সঙ্গে বিকাশবাবুর সম্পর্কটা কি? সুলতান নামটা চেনা থাকলেও বেলা নামটা অপরিচিত।

সুলতান সাব?

হ্যাঁ। যদিও জানি সুলতান মারা গেছে। তাই ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে। আর বিকাশবাবুর সঙ্গে নাম দুটোর সম্পর্ক কি?

সুলতান আর বেলা ও দুটো সাব—

হ্যাঁ বল।

সুলতান আর বেলা—

কাল্লু, আমি কাজের লোক, অযথা সময় নষ্ট করো না।

মিঃ সেন কঠিন গলায় বল্লেন কাল্লুকে।

সুলতান আর বেলার নাম কোথায় পেলেন সাব?

বিকাশবাবুর লেখা কাগজে। এখন শীগ্রি বল। তাদের সঙ্গে বিকাশবাবুর সম্পর্ক কি?

হামার মনে হচ্ছে সাব আপনারা ভুল করছেন।

তোমাকে বাজে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছি কাল্লু।

সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলেন মিঃ সেন।

সাব, ও দুটো হচ্ছে—ঘোড়ার নাম। গত হপ্তার টিপে হামি এক জকির থেকে জেনে বিকাশবাবুকে জানিয়েছিলাম।

দুটো ঘোড়ার নাম?

হঁা সাব।

এবার মিঃ বাগচী প্রশ্ন করেন—কোন্ জকি? নাম কি তার?

জকির নামটা কাল্লু দ্বিধার সঙ্গে বলে দেয়। মিঃ বাগচী নামটা লিখে নিয়ে টার্ফ ক্লাবে ব্যাপারটা জানতে মিঃ সেনকে বলে দেন।

মিঃ সেন সম্মতি জানান ঘাড় নেড়ে।

কাল্লু আবার বলে—সেইজন্য সাব, হামাকে টাকা দেবে বললে বিকাশবাবু।

ঠিক সেই সময়ে লালবাজার কণ্ট্রোল রুমে বেতারে খবর আসে, দিছ ইজ ডবলিউ বি সেভেন রিপোর্টিং। দিজ ইজ ডবলিউ বি সেভেন রিপোর্টিং টু কণ্ট্রোল।

এধার থেকে জবাব যায়—ইয়েস ডবলিউ বি সেভেন। দিজ ইজ কণ্ট্রোল রুম স্পিকিং? গো এহেড।

ওয়ারলেস ভ্যানটি থেকে জানায় যে, একটি মৃতদেহকে সে লাভার্স লেনে পেয়েছে। মনে হচ্ছে, তাকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় থানায় সংবাদ পাঠিয়ে ঘটনাস্থলে সে দাঁড়িয়ে আছে।

কথা কটি লিখে নিয়ে অপারেটর জানায়—ডবলিউ বি সেভেন—ষ্টে দেয়ার আনটিল ইট রিসিভ ইনষ্ট্রাকশন ফ্রম কণ্ট্রোল রুম।

কথা কটি টেলিফোনে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে জানানর জন্যে সংযোগ করে কণ্ট্রোল রুম থেকে।

ক্রিরি-রি···রিঙ···ক্রি···রি···রিঙ।

মিঃ সেন টেলিফোনটা তুলে ধরেন।

হ্যালো···এস, আই সেন বলছি···কোথায়? ঠিক আছে।

ফোনে শোনা কথাগুলো নোট বইতে লিখে নিতে নিতে মিঃ সেন মিঃ বাগচীকে উদ্দেশ্য করে বললে—স্যার, লাভার্স লেনে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব খুন।

মিঃ বাগচী জবাব দিলেন—দেখ, কোন আলালের নন্দন পুষ্প তুলতে গিয়ে সর্পদংশিত হ'ল। যাই হোক, ডি. সি, কোয়ার্টারে জানিয়ে দাও।

ডেপুটি কমিশনারকে জানাতে, তিনি মিঃ সেন এবং মিঃ বাগচীকে ঘটনাস্থলে যেতে বলে দিলেন।

আদেশটি মিঃ বাগচীকে জানিয়ে, কাল্লুর উদ্দেশ্যে বললেন—কাল্লু আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত, আমাদের অতিথি হয়ে থাক। নিতাই—

মিঃ সেনের ডাকে নিতাই ঘরে আসে। মিঃ সেন নিতাইকে কাল্লুর চৌকিদারীতে রেখে রওনা দিলেন ঘটনাস্থলের দিকে।

পুলিশের কালো রঙের স্পীডো মিটারের কাঁটায় দ্রুতগতির নির্দ্দেশ দেখা যায়।

· ·

লাভার্স লেন।

পশ্চিমী দেশের অনুকরণে ডাকা হয়ে থাকে রাস্তাটাকে, তার সব সময়ের নির্জনতার জন্য। সত্যি এই নির্জন পরিবেশ সম্বন্ধে অজানা কিছু নয়—অনেক কথাই জানা। কারও উন্মাদনা অস্থিরভাবে ফোঁস ফোঁস করে ফেলছে নিঃশ্বাস, কাদের এই নির্জনতার সুযোগে কিছু হয়েছে হারাতে। কাউকে এই নির্জনতাই দিয়েছে গভীর পারস্পরিক প্রীতি-পরিচিতির অবকাশ—এ রকম অনেক কথাই মিশে রয়েছে ওখানকার গাছপালাগুলোর নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। এ সবই জানা।

পুলিশের ওয়ার্লেস ভ্যানটা বিরাট সার্চলাইট ফেলে দাঁড়িয়েছিল।

কোন কোন গাড়ী চলে যাবার মুহূর্তে একটু আস্তে করে আবার হুশ করে বেড়িয়ে যায়।

দূর থেকে মিঃ সেন ও মিঃ বাগচীদের দল নিয়ে জীপটা এসে দাঁড়ায়। স্থানীয় থানার অফিসার-ইনচার্জ তাঁর দলবল নিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই বেষ্টনী ভেদ করে ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ বাগচী আর মিঃ সেন গিয়ে দাঁড়ান। ফটোগ্রাফার ব্যস্ত হয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে মৃতদেহের ছবি নেয়।

ওয়্যারলেস ভ্যানের সার্জেণ্ট, মিঃ সেনদের দেখে এগিয়ে আসেন তাদের দিকে এবং মিঃ বাগচীকে অভিবাদন জানান।

মিঃ বাগচী অভিবাদন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করেন—

বডিটা কিভাবে পাওয়া গেল?

সার্জেণ্ট জানালেন—

আমি ভ্যান নিয়ে ইউস্যুয়াল রাউণ্ডে পাস করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, রাস্তার একটু ভিতর দিকে প্রায় ফুটপাতের উপর কে একজন শুয়ে রয়েছে। সন্দেহ হল—কি ব্যাপার? ভালো করে জানতে, গাড়ী থামিয়ে নেমে দেখি, রক্তাক্ত অবস্থায় একটা লোক পড়ে রয়েছে।

তখন কি জ্ঞান ছিল? না কি অন্য কিছু বলে মনে হয়েছে?

জীবনের কোন চিহ্ন ছিল না। পরিষ্কার একটা খুন বলে মনে হ'তে খবর দিয়েছিলাম।

এদিক দিয়ে গাড়ী ত' মন্দ যায় না। তারা কেউ এ ব্যাপারটা দেখে নি।

অদ্ভুত!

হয়ত আপদ মনে করে ওভারলুক করেছে।

সার্জেণ্ট ভদ্রলোক মৃদু হাসি হেসে জবাব দেন।

হুঁ? আচ্ছা সেন, চল।

মিঃ বাগচীর সঙ্গে মিঃ সেন একটু এগিয়ে এসে দাঁড়ান। মিঃ

বাগচী ফটোগ্রাফারকে উদ্দেশ্য করে বলেন—কি, তোমার কাজ শেষ হয়েছে ত?

হ্যাঁ স্যার।

ফটোগ্রাফারের কথা শেষ হতেই মর্গের কালো ক্রশ দেওয়া গাড়ীটা এসে দাঁড়ায়। গাড়ীটা থেকে ডাক্তার তাড়াতাড়ি নেমে দেহটির কাছে চলে যান এবং পরীক্ষা শেষে মিঃ বাগচীদের সামনে এসে দাঁড়ান।

মিঃ বাগচী ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন—ডেড?

ডাক্তার মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন—হ্যাঁ। ষ্ট্যাবিঙের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

ষ্ট্যাব কোথায় করেছে?

বাঁ দিকের পাঁজরায়। ডিটেইল রিপোর্টে বোঝা যাবে সব।

হ্যাঁ। যাক, এবার আমরা দেখে নি।

একটু চিন্তিতস্বরে জবাব দেন মিঃ বাগচী।

মিঃ সেন এবার মৃতদেহটিকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে এগিয়ে আসেন। দেখেন, বাঁ পা-টা ভাঁজ করা। বাঁ দিকের বুকের পাঁজরে ছোড়ার আঘাতের চিহ্ন এবং চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। পরণে ফুলপ্যান্ট আর বুশ সার্ট। একটা চটি দেহ থেকে কিছু দূরে পড়ে রয়েছে। আর একটা চটি পায়ে কোনক্রমে আটকে আছে। মিঃ সেন হাঁটু গেড়ে বসে মুখের দিকে ভালো করে দেখে চমকে ওঠেন!

বিকাশ ঘোষ।

পকেট থেকে বিকাশের বাড়ী থেকে জোগাড় করে আনা ফটোটা বার করে ভালো করে মিলিয়ে নেন মিঃ সেন।

কে মারল? মিঃ সেন যা ভেবেছিলেন, তাই ঠিক। বিকাশ জানত অনেক কিছু। সেই জানাটাই কি ওর মৃত্যুর কারণ?

না কি, শুভেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে কোন যোগ নেই এর। বিকাশ

কাউকে ব্ল্যাকমেইল করেছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল—নয় ত সে-ই ব্ল্যাকমেইলার ? কিন্তু এটাই বেশি করে মনে হয় যে, বিকাশ হয়ত শুভেনবাবুর খুনের ব্যাপারে জানত অনেক কিছু।

স্যার।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই মিঃ বাগচীকে লক্ষ্য করে ডাকেন মিঃ সেন।

মিঃ বাগচী, স্থানীয় থানার অফিসার-ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিঃ সেনের ডাকে এগিয়ে আসেন।

কি ব্যাপার সেন ?

যে মার্ডার হয়েছে, সে বিকাশ ঘোষ।

ইউ মিন—

একটু কৌতূহলী স্বরে প্রশ্ন করেন মিঃ বাগচী। একটু বিস্মিতও হন তিনি

হ্যাঁ স্যার। যাকে আমরা খুঁজছিলাম, এবং আজকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছিল, এ সেই বিকাশ ঘোষ।

মিঃ সেন, বিকাশের মৃতদেহটির দিকে চেয়ে জবাব দেন।

সেন, তোমার উচিত ছিল, বিকাশ যখন কাল্লুর ডেরায় ছিল, ওকে ধরা।

কিন্তু পাখি যদি সেখানে না থাকত, তার বাসায় পাড়ি দিলে আর হয়ত ফিরত না। সেইজন্যে বিকাশের উপস্থিতির সঠিক খবর না পেয়ে কিছু করিনি—কিন্তু কে বিকাশকে খুন করল ?

দ্যাট ইজ হোয়াট উই সুড ফাইণ্ড আউট রাদার ইউ সুড মাই বয়।

মিঃ বাগচী, জবাব দেন।

মিঃ সেন উঠে দাঁড়ান। ডাক্তার তখনও দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন মিঃ সেন—

আচ্ছা, কতক্ষণ আগে মারা গেছে বলে মনে হয় আপনার ?

তা এপ্রক্সিমেটলি ঘণ্টা দেড়েক আগে।

মিঃ সেন হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে অনেকটা নিজের মনে মনে যেন বলেন—

তার মানে বিকাশ, নিতাইকে বোকা বানিয়ে সরে পড়ার পর. সোজা এইখানে আসে। তাহলে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা এই সময়ের মধ্যে বিকাশ খুন হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি।

মিঃ সেন আবার নীচু হয়ে পকেটগুলো খোঁজেন। কয়েকটা পয়সা প্যান্টের একটা পকেট থেকে বেড়োয়। আরেক পকেট থেকে বেড়োয় একটা ছোট্ট পকেট ডাইরী আর একটা নোংরা রুমাল। নোট বইটা ভালো করে দেখতে থাকেন মিঃ সেন। টুপ করে দুটো কাগজ ডাইরীটার ভেতর থেকে মাটিতে পড়ে যায়। মিঃ সেন কাগজ দুটি তাড়াতাড়ি তুলে নেন। একটি ছোট্ট চিরকুট—বুকির কাছে পয়সা দিয়ে রেস খেলার চিরকুট সেটা। আরেকটা চিঠি। মিঃ সেন মনোযোগ দিয়ে সেটি পড়েন—যদি কোন আভাষ পাওয়া যায়।

চিঠিটাতে লেখা আছে ঃ

বিকাশবাবু,

আপনি যে টাকার কথা জানিয়েছেন, সে অঙ্কের টাকা বর্তমানে ব্যবসায়ের অসুবিধার জন্য আপনাকে দেওয়া সম্ভব নয়। এর আগে অনেক টাকাই ত নিয়েছেন। উপরন্তু, এত টাকা দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

যাই হোক, অনিচ্ছাসত্বেও টাকা যখন দিতে হবে আপনাকে, তখন দেবই। তবে আমার অসহায় অবস্থার বেশি সুযোগ নিলে সেটা যে আপনার পক্ষে মঙ্গলের হবে না, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবেন। এই বিষয়ে একটু কথা বলে নেওয়ার দরকার বলে আগামী কাল সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে লাভার্স লেনে অবশ্যই দেখা করবেন—পারি ত কিছু টাকা তখনই দিয়ে দেব।

কোন নাম চিঠিটার তলায় নেই। একটা সূত্রের মিল চিঠিটাতে আছে। রহস্যগন্ধী চিঠি। ব্ল্যাকমেইল-এ কথাটা বোঝা যাচ্ছে। আরও বোঝা যাচ্ছে, যে এই খেলায় অংশ নিয়েছিল সে একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু কেন? কি কারণে বিকাশের কথায় টাকা দিয়ে গেছে। কোন দুর্বলতায়? ব্যবসায়ী। তবে কি রূপেনবাবু? তিনিও ত ব্যবসাদার। পাপিয়া রায়কে গুম তিনিও করতে পারেন। কারণ অবশ্য জানা।

মিঃ সেনের মাথার মধ্যে এক এক করে কথা ভাসতে থাকে। শুভেনবাবুর খুনের সঙ্গেও বিকাশের খুন জড়িত থাকতে পারে। তার সম্ভাবনাই বেশী। তাহলে সেদিক থেকে ব্যাপারটা দাঁড়াবে—

শুভেনবাবুর খুন যাদের দ্বারা ঘটেছিল—বিকাশ তাদের জানত বোধ হয়। শুভেনবাবুর দুর্ঘটনার পরই বিকাশের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার চেষ্টা মিঃ সেনকে সন্দিগ্ধ করেছে—বিকাশ কিছু জানে বা কোন একটি ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত। আর বিকাশকে খুন করেছে—এই ব্ল্যাকমেইলার এবং দুটো ঘটনায় যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

শুভেনবাবু আর বিকাশের খুনীর বিপক্ষে সূত্রের কোন জোরই নেই—যার দ্বারা ব্যাপারটার ছন্নছাড়া চেহারাটাকে একটা সম্পূর্ণতায় আনা যায়।

চিঠিটা হাতে নেড়ে-চেড়ে মিঃ সেন নোটবইটা পকেটে রেখে দেন। পরীক্ষা করে দেখতে হবে যদি কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়।

কি সেন, কিছু পেলে?

একটা চিঠি। তবে কাকে লেখা জানা গেলেও, কে লিখেছে জানা যাচ্ছে না।

হুঁ। তোমার কি মনে হয় সেন—আই মিন এই মার্ডারটার সম্বন্ধে?

মিঃ বাগচী প্রশ্ন করেন আবার।

আমার মনে হয় স্যার —শুভেনবাবুর খুনের সঙ্গে এ খুনের যোগ আছে।

কি কারণে বলছ ?

কারণ স্যার, মনে হচ্ছে ব্ল্যাকমেইল বিকাশ যাকে করেছিল—সে টাকা দিচ্ছিল, কিন্তু বিকাশ কোন কারণে দাবী বাড়ায়—সেই কারণে। আর প্রথম খুনের পরই বিকাশ উধাও হয়ে যাওয়াই এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এভাবে মৃত্যু হওয়াতে ঐ ধারণাই হচ্ছে। বিকাশ যদি কিছু না জানবে অথবা কিছু না করবে, তবে উধাও হবে কেন ?

—রাইট। ব্ল্যাকমেইলয়ে লোকটার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশাতেই বিকাশ পালিয়েছিল, কারণ সে জানত, হয়ত আমাদের চাপে কিছু বলে ফেলতে পারে। সুতরাং যোগাযোগ না থাকলে বিকাশ নিশ্চয়ই পালাত না। তাহলে খুনীর গাড়ীর নম্বর ডবলিউ, বি, সি, নাইন, নাইন।

মিঃ বাগচী প্রায় এক নিঃশ্বাসে যেন কথাগুলো শেষ করেন।

মিঃ সেন তীক্ষ্ণ চোখে পরিবেশের চারিদিকে সম্ভাব্য পরিধির মধ্যে চোখ বুলিয়ে নেন। হঠাৎ কিছুদূরে কিসের যেন দাগ দেখে মিঃ সেন তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে যান। হাতের টর্চের আলোটা ফেলেন।

কোন গাড়ীর কার্বোরেটর লিক্ আছে—সেখান দিয়ে তেল পড়েছে বেশ খানিকটা। গাড়ীটা অনেকক্ষণ বোধহয় দাঁড়িয়েছিল।

মিঃ সেন আস্তে আস্তে মিঃ বাগচীর পাশে এসে দাঁড়ান। মিঃ বাগচী মৃদু হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কিসের আশায় গেছিলে সেন ?

কিছুই না। একটু তেলের দাগ।

ও। যাক, এখানে প্রায় কাজ শেষ, কি বল ?

স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ মিঃ বাগচীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আচ্ছা, কুকুরটাকে লালবাজার থেকে আনান না ?

মিঃ বাগচী জবাব দেন—কিছু লাভ হবে না তাতে। কোন ট্রেইলে লাগাব তাকে বলুন? তাছাড়া খুনীকে না জানলেও, খুন কে হয়েছে, কোথা থেকে এসেছে, তা বলতে গেলে আমরা জানি।

মিঃ সেন এবার বলেন—আমাদের ধারণা মত আর একটা মার্ডার এর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। কিন্তু সেখানে বৃষ্টিতে কিছু করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু ট্রেইল ত মিস হবেই। আর জড়িত ঘটনার নী হলে সে গাড়ীতেই এসে থাকবে।

অফিসার ইনচার্জ ভদ্রলোক আর কিছু বলেন না। মিঃ বাগচী মর্গের গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ান। লোক দুটিকে ইশারা করতে তারা ষ্ট্রেচার নিয়ে মৃতদেহের কাছে এগিয়ে আসে। আস্তে আস্তে তারা দেহটি গাড়ীতে তুলে নেয়।

মর্গের গাড়ীটা চলে যায়। চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মিঃ সেনের কাঁধে হাত রাখেন মিঃ বাগচী।

চল সেন, এবার অফিসের দিকে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ স্যার, চলুন।

সকলে গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। মিঃ সেনের মনে আলোড়িত হতে থাকে দুটি কথা—কেন? কে? কেন? কে খুন করতে পারে?

দুপুরবেলা। রোদের তেজ বেশ রয়েছে।

অমিতাভ শ্লথ পায়ে হেঁটে চলেছিল রাস্তাটা দিয়ে। কোন ফল নেই এইভাবে খুঁজে বেড়ানর মধ্যে—কোথায় পাওয়া যাবে পাপিয়াকে? তবু ঘুরে বেড়ায় জনারণ্যমণ্ডিত এই কলকাতা শহরে। অর্থহীন আশায় মনের মাঝে প্রতিফলনে অমিতাভ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেরিয়েছে একদিন।

রমেন্দ্রবাবু আজ সকালে অমিতাভকে বলছিলেন—অমিতাভ, পাপিয়ার মুক্তিপণ ত এখনও কেউ চাইছে না। তবে কি পাপিয়া আর বেঁচে নেই?

অমিতাভ যুক্তির আওতায় কোন সান্ত্বনা জানাতে পারে নি। শুধু আশার কথা জানিয়েছে। তার নিজেরও যেন মনে হয়েছে—না, পাপিয়া বেঁচেই আছে।

অমিতাভকে আজ এক হতাশা যেন চেপে ধরেছে। মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা বিরাট ট্র্যাজেডীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আজকে সকালের খবরের কাগজে বেরিয়েছে—লাভার্স লেনে খুন।

গতকাল সন্ধ্যা সওয়া আটটা নাগাদ পুলিশের ওয়ারলেস ভ্যান লাভার্স লেনে ছুরিকাহতাবস্থায় একটি দেহ আবিষ্কার করে। খবরে প্রকাশ যে, উক্ত ভ্যানটি ঐ স্থান দিয়া যাইবার কালে একটি দেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সার্জেন্টের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং গাড়ী থামাইয়া নিকটে যাইতেই তিনি ব্যাপারটি বুঝিয়া ফেলেন ও যথাস্থানে খবর পাঠাইয়া দেন।

ইহা একটি খুন—এ কথা ছাড়া পুলিশী সূত্রে কিছু জানা যায় নাই। অধিক রাত্রি পর্যন্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, এ সূত্রে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। জোর তদন্ত চলিতেছে।

খবরটা এতই আকস্মিক যে, প্রথমে এই বিকাশ ঘোষ যে শুভেন বাবুরই ভাগ্নে, এ কথাটা বিশ্বাস করতে চায় নি অমিতাভ। মিঃ সেনকে টেলিফোন করতে, মিঃ সেন জানালেন—হ্যাঁ, শুভেনবাবুর ভাগ্নে বিকাশ ঘোষই খুন হয়েছে। বিকাশবাবুর মা চারু দেবী দেহ সনাক্ত করেছেন।

খবরটা সম্বন্ধে স্থির হতে অমিতাভ জানতে চেয়েছিল—পাপিয়ার কোন খবর—

ভেরি সরি। এখনও কোন রকম খবর পাই নি আমরা।

বিকাশের উপর অমিতাভ সন্দেহ করেছিল যে, পাপিয়াকে বিকাশই সরাতে পারে। কিন্তু—

না, এই ব্যর্থ, আশাহীন খুঁজে বেড়ানর মধ্যে কোন ফলশ্রুতি নেই। মন ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে বাস ষ্টপের দিকে এগিয়ে যায় অমিতাভ। বাড়ীতেই ফিরে যাবে ঠিক করে সে। আর ভালো লাগছে না কিছু।

বাস আসতে বেশ দেরী হয়। এরপর যে বাসটা আসবে, সেটা যে কি রকম লোক নিয়ে আসবে, অমিতাভ তা ধারণা করে নেয়।

অমিতাভ অলসভাবে চোখটা চারিদিকে বুলিয়ে নেয়। বাস ষ্টপেজে জনাকয়েক লোক ইতঃস্তত দাঁড়িয়ে আছে। পথের দিকে তাদের ঘন ঘন দৃষ্টি দেখে অমিতাভ বুঝতে পারে যে, তারই মত বাসের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষমান এরা। কিছুটা দূরে বোরখা পরা একজন মুসলমান মহিলা আর তার সাথে দু'জন লোক। তারাও অপেক্ষা করছে বাঘ মার্কার জন্যে। দোকানগুলি ত্রিপলের পর্দায় গা ঢেকে রয়েছে। লোকজন খুব একটা চলছে না। দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে অমিতাভ মাথা নীচু করে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে। মনে মনে একটু অধৈর্যও হয়।

অধীরতা ভেঙে দেখা গেল একতলা বাসটার অগ্রগতি। বাসের আবির্ভাব উৎসবে যোগ দেবার জন্যে যেন ষ্টপেজে অপেক্ষা করা লোকেদের ভীড় বেড়ে যায়। বাস যত এগিয়ে আসে, ভীড়টাও যেন জমাট বেঁধে এগিয়ে যায় একটু।

হুড়োহুড়ি—লোকের আকুতি—তর্জন গর্জন—কণ্ডাক্টরের চীৎকার। সব মিলিয়ে জায়গাটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে।

অমিতাভ আর পেছনের গেটটার দিকে যায় না। ওখানে বেশী ঠেলাঠেলি। সামনেই প্রথম গেট। শেষ লোকটি নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ উঠে পরে ভেতরে এসে জায়গা করে নেয়।

কারো পায়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগে অমিতাভর। স্বভাবতঃই অমিতাভ তার পাশাপাশি লোকেদের দিকে চায়। এক পাশে এক বয়স্ক ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য পাশে সেই বোরখা পরা মহিলাটি। অমিতাভর দিকে মুখটা ফেরান। অমিতাভ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অল্প একটু সরে দাঁড়ায়।

আবার ধাক্কা লাগে অমিতাভর পায়ে! এবার যেন একটু জোরে। এ ত প্রায় ইচ্ছাকৃত মনে হচ্ছে! কিন্তু কে এরকম রসিকতা করতে পারে? একটু অসন্তুষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে অমিতাভ।

কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার সেই একই ব্যাপার! পায়ের পাতাটাকে কেউ জোরে আঘাত করে! মনে মনে চটে ওঠে অমিতাভ। কিন্তু কাকেই বা ধরা যায়। এ রকম অদ্ভুত ধরণের রসিকতা কে করছে? একটু সতর্ক হয়ে যায় অমিতাভ। ভাবে, এবার রসিক প্রবরকে ধরতে হবে। দৃষ্টিটা সে অন্যদিকে রাখে, কিন্তু চোখের কোণায় লক্ষ্য রাখে নিজের পায়ের দিকে।

একটা পা সতর্ক ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে অমিতাভর পায়ের কাছে এগিয়ে এসে ধাক্কা দেয়!

মুখটা দ্রুত ফেরাতে সাদা জালের ফাঁক দিয়ে কালো চোখটার সঙ্গে যেন দৃষ্টি বিনিময় হয়। বিস্মিত দৃষ্টিতে অমিতাভ চেয়ে থাকে পর্দানশীনের দিকে! কিছুই যেন বুঝতে পারে না সে।

সেই চেয়ে থাকার মাঝেই পায়ের উপর আবার চাপ দেয় ওই বোরখা ঢাকা মেয়েটির পা! যাত্রীদের কথাবার্তা, বাসের অগ্রগমনের সশব্দ ইঞ্জিনবার্তা, তার মাঝে অস্ফুট গোঙানীর আওয়াজ যেন নিঃসৃত হয় বোরখার ভিতর থেকে। জালের ফাঁকে চোখটা যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

পাগল নাকি? না আমার দাঁড়ানর জন্যে কোন অসুবিধা হচ্ছে ওর? মনে মনে ভাবে অমিতাভ। আবার যতটা সম্ভব নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সে।

টিকিটটা কাটবেন ?

কণ্ডাক্টর টিকিট চায়।

অমিতাভ টিকিটের পয়সা দিয়ে টিকিটটা নিয়ে নেয়। কণ্ডাক্টর একটু সরতে আবার অমিতাভর পায়ে চাপ পড়ে।

যন্ত্রণায় পড়া গেল। মহিলাটি কি কিছু বলতে চাইছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ? কি অসুবিধা হচ্ছে ওর অমিতাভ বুঝতে পারে না ?

অমিতাভ থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন ত ?

ক্যা হুয়া বাবুজী ?

প্রশ্নে মুখ ঘোরাতেই মহিলাটির সাথী দু'জনের একজন কথাটা জিজ্ঞেস করে। অমিতাভ জবাব দেয়—না, উনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করছি।

লোকটি একটু রাগত স্বর নিয়েই যেন বলে—ক্যা বিবি, হুয়া ক্যায়া ? হঁাঃ—

জবাবে শুধু অস্ফুট গোঙানীর শব্দ কানে আসে অমিতাভর। বোবা বোধহয়।

লোকটি তখন যেন শব্দ থামাবার জন্যে বলে—হঁা, ঠিক হ্যায়, ক্যা তকলিফ হোতা, বোল।

কিন্তু বোরখা পরা মহিলাটি আকারে ইঙ্গিতে কোন আপত্তি না জানিয়ে অমিতাভর পায়ে আবার ধাক্কা দেয়। ব্যাপারটা রহস্যজনক বলে মনে হয় অমিতাভর।

তবে কি সে কিছু বলতে চাইছে অমিতাভর কাছে ? বোরখার ভিতরের মুখটা দেখার আকাঙ্খা হয় অমিতাভর। কিন্তু সে ইচ্ছা তার মনেই থেকে যায়।

মনে একটা গুঞ্জনও ওঠে অমিতাভর। মহিলাটি কিছু জানাতে চায় কি ? কি কথা সেটা, যা সঙ্গের লোকটিকে না বলে অমিতাভর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ?

আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন ত? অমিতাভ বলে।

বোরখার আবরণ শুদ্ধ মাথাটা নড়ে ওঠে। যেন কিছু বলবে ও।

বোরখাটা খুলে বলুন। যদি কথা না বলতে পারেন ইশারাটা বুঝব।

মহিলাটির সঙ্গের দ্বিতীয় লোকটি এবার ফুঁলে ওঠে—কি মশা—আঁ—জানানার সোঙ্গে তখুন থেকে বাত বলবার চেষ্টা করছেন। আঁ—আপনি না ভদরলোক—

অমিতাভকে যেন ভুতে পেয়েছে। সে তবু বলে—বোরখাটা খুলুন।

কি, জানানার বোরখা খুলতে বোলছেন। দ্বিতীয় লোকটি ঘূর্ণিত চোখে চেয়ে বলে।

কি ব্যাপার ভাই? বাসের এক যাত্রী বলে ওঠেন।

যাত্রী ভর্তি বাসের সকলেই সকৌতূহলী। নানান রকমের জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে চেয়ে থাকে অমিতাভর দিকে। ব্যাপাবটা একটু গুরুতর আকার ধারণ করছে এটা সকলেই বুঝতে পারে।

পায়ের অস্থিরতা যেন আরও বেড়ে যায়। যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছে মহিলাটি।

অমিতাভর পাশের এক যাত্রী তখন বলছেন—সে কি মশাই, বোরখা খুলতে বলছেন কেন? গণ্ডগোল পাকাবেন দেখছি।

সেই অস্থির পদতারণার মাঝে অমিতাভ আবার বলে—আপনি বোরখা খুলবেন, না কি আমি খুলে দেব?

বোরখা ঢাকা মাথাটি সবেগে যেন সম্মতি জানায়।

দেখেন মশা, ফের যদি বো' খা খোলার কথা বোলেন—তাহলে খুব খারাপ হোবে। সতর্ক করে বলে দেয় সেই দ্বিতীয় লোকটি।

আরে যেতে দিন মশাই, যেতে দিন। কি ঝামেলা পাকাচ্ছেন। বাসের এক শুভার্থী যাত্রী জানান।

মহিলাটির সঙ্গের প্রথম লোকটি বলে ওঠে দ্বিতীয়ের উদ্দেশ্যে---আরে ছোড়, ছোড়।

তারপর অমিতাভকে বলে—বাবু, হাপনি বোরখা খুলবেন বোলছেন—সেটা খুব ওন্যায়। আউর ইজ্জতের কথা ভি আছে। হাপনার তখলিফ হোলে হামরা লেমে যাচ্ছি।

কথাটি শেষ করে সে মহিলাটির কাঁধ ধরে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং বলে—বোখকে কণ্ডাক্টর সাব। জানানা হ্যায়।

কিন্তু লোকটির আকর্ষণে মহিলাটি অনিচ্ছা প্রকাশ করে দেহটা একটু শক্ত করে দাঁড়ায়।

ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগে।

দাঁড়ান। চেঁচিয়ে ওঠে অমিতাভ।

মহিলাটির কাছে এসে একটানে সামনের লেসের জালের অংশটা তুলে দেয়।

এ কি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় অমিতাভ। কথা ফুটতে চায় না। সমস্ত বাসের লোকগুলোও যেন পরম বিস্ময়ে নীরব থাকে।

সমস্ত চিন্তা যেন জমাট বেঁধে যায়। অবিশ্বাস্য মনে হয় সব কিছুকে। মূক হয়ে যায় মুখ।

পাকড়ো। পাকড়ো।

চীৎকার করে ওঠে কেউ কেউ।

আরে মশাই ধরুন।

আরেকজন কে যেন বলে ওঠে।

একটু সামলে নেয় অমিতাভ। কিন্তু বেশী কিছু বলতে পারে না। আনন্দ আর বিস্ময়ের অকস্মাৎ সংমিশ্রণে সে বলে ওঠে—পাপিয়া, তুমি—

বাসটা থেমে গিয়েছিল। চলতি গাড়ী থেকে নেমে পড়ে লোক

ছুটি যে পথে পালিয়েছিল, সেইপথে কয়েকজন নেমে ছুটে যায়। গোলমাল চলে নানা মন্তব্যে।

পাপিয়া! কৃশ, মলিন হয়ে গেছে তার চেহারা। অযত্নে চুলগুলো রুক্ষ। সেই কালো চোখ দুটোয় জলের ফোঁটা। বুঝি, আনন্দের। ভ্রুর উপর কাটা দাগটা যেন স্পষ্ট মনে হয়। ময়লা একটা শাড়ী পরনে। ঠোঁট দুটি চওড়া প্লাষ্টারে আটকান। হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকের উপর দড়ি দিয়ে বাঁধা—সঞ্চালনের অক্ষমতার জন্য।

সম্বিৎ ফিরে পায় অমিতাভ দুই সহযাত্রীর কথায়—আরে মশাই, আপনিই ত' দেরী করলেন।

আমি—আমি ঠিক বুঝিনি ব্যাপারটা।

হ্যাঁ, তখন আমারও সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলেন কিনা?

অমিতাভ সে কথায় আর কান দেয় না। আস্তে আস্তে পাপিয়ার হাতের বাঁধন খুলে দেয়। পাপিয়ার চোখ দুটি অমিতাভকে ধরে রাখে একদৃষ্টিতে।

লালবাজার যাবে ভাই।

কণ্ডাক্টর ব্যাপারটার গুরুত্ব ড্রাইভারকে বুঝিয়ে বলে।

বাঁধকে। বেঁধে।

অনেকে নেমে যায়। কা'জ বিলম্বে পেঁীছবার ভয়ে কেউ বা লালবাজারে নামে। বাসের ভীড় একটু কমে যায়। কেউ বা বসে থাকে এই মজার খেলার সঙ্গী হবার আনন্দে অথবা শেষ দেখার ইচ্ছায়। কারও মনে ভুরভুরি কাটে জিহ্বা তরঙ্গে রসাল কোন আলোচনার রসদ জোগানর তাগিদে। বাস চলতে শুরু করে।

ঠোঁটের প্লাষ্টারটা খুলে দেয় অমিতাভ। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে দেখায়। মুখের ভেতর থেকে কিছু কাপড়ও বার করে দেয় সে।

পাপিয়া নীরবে নিরীক্ষণ করে অমিতাভকে। চোখের জলের ফোঁটা দুটো গাল বেয়ে নেমে আসে।

পাপিয়ার হাত ধরে দাঁড়ায় অমিতাভ। আশ্বাসের মৃদু চাপ দেয়

একটু কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায় পাপিয়া। অমিতাভর হাতটা যেন আঁকড়ে ধরে।

অমিতাভ ভাবে—এ একেবারে গল্পের মত। ঘটনাটা ভাবতে চেষ্টা করে প্রথম থেকে। রূপকথার মত মনে হয়।

লালবাজারে মিঃ সেন খবর পেতেই তাড়াতাড়ি চলে আসেন। অমিতাভকে জিজ্ঞেস করেন—কোথায় পেলেন?

অমিতাভ আস্তে আস্তে নাটকীয় ঘটনাটা খুলে বলে মিঃ সেনকে। মিঃ সেন বলেন—তাহলে বোঝা যাচ্ছে মিস রায়ের সঙ্গের লোকগুলোও ছদ্মবেশে ছিল। কিন্তু এ রকমভাবে রিস্ক ওরা নিল কেন?

একটু থেমে আবার বলেন তিনি—এনিওয়ে উই শ্যাল ফাইণ্ড আউট স্থন। ভালো কথা, মিঃ রায়কে খবর দিয়েছেন?

না। এখানকার টেলিফোনটা ইউজ করব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুন

মিঃ সেন অনুমতি দেন।

টেলিফোনটা তুলে ধরে অমিতাভ। একটু উত্তেজনা তার শিরায় শিরায় খেলছিল—সেটাকে একটু দমন করে প্রস্তুত হয়ে নেয় সে।

হ্যালো।

হ্যালো। ফোর সিক্স…

জী হাঁ।

কে, বাহাদুর?

জী।

বড়বাবু বাড়ীতে আছেন?

হাঁ।

তাঁকে একটু ডেকে দাও। বল, অমিতাভবাবু কথা বলতে চায়

জী।

ক্ষণেক স্তব্ধতা। পাপিয়া অমিতাভর দিকে বোবা চাউনি নিয়ে একইভাবে বসে আছে। কালো ছুটো চোখ অজানা ভয়ে বুঝি অমিতাভকে ধরে রাখতে চায়।

হ্যালো, কে? অমিতাভ? রমেন্দ্রবাবুর গলার সাড়া মেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি ব্যাপার?

লালবাজার থেকে বলছি।

অমিতাভর জবাবে একটু চিন্তিতকণ্ঠে রমেন্দ্রবাবুর কথা ভেসে আসে—লালবাজার!

হ্যাঁ। শুনুন, পাপিয়াকে—

পাপিয়াকে—কি?

পাপিয়াকে পাওয়া গেছে।

এ্যাঁ। কোথায় পাওয়া গেল? কিভাবে?

একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যেন রমেন্দ্রবাবু।

এখানে এলে সেটা জানতে পারবেন।

পাপি এখন কোথায়?

এখানে আমার সঙ্গেই আছে।

ও, তাহলে শোন, পাপির মাকে ডাকি। তুমি খবরটা দিয়ে দাও।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে—শুনুন, ওনাকে পরে বলা যাবে। কারণ, উনি মেণ্টাল ষ্ট্রেইনের মধ্যে রয়েছেন, উপরন্তু শরীরও একটু ছুর্বল হয়ে পড়েছে। হঠাৎ খবরটা—

তা ঠিক। তাহলে—

অপেক্ষা করেন রমেন্দ্রবাবু উত্তরের আশায়।

আপনি গাড়ীটা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আসছি। বুঝেছ, এখনই আসছি।

একটু আবেগ মিশ্রিত গলা শোনা যায় রমেন্দ্রবাবুর।

আচ্ছা।

শোন অমিতাভ, পাপি ভালো আছে ত ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আচ্ছা। আমি আসছি এখুনি, কেমন ? ছেড়ে দিলাম।

টেলিফোনটা রেখে মিঃ সেনকে অমিতাভ জানায় রমেন্দ্রবাবু আসছেন। পাপিয়া নিঃশব্দে অমিতাভর টেলিফোনে কথা বলা শুনছিল।

অমিতাভ পাপিয়ার পাশের চেয়ারটায় এসে বসে! কপালের উপর ঝড়ে পড়া রুক্ষ চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দেয় অমিতাভ।

পাপিয়া অমিতাভর হাতটা তার নবম মুঠিতে যেন নির্ভরতায় চেপে ধরে। আবার ছোট্ট ছোট্ট জলের ফোঁটা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে গালে।

মিঃ সেন তীক্ষ্ণ চোখে পাপিয়াকে এতক্ষণ দেখছিলেন। তারপর পাপিয়াকে মিঃ সেন বললেন—মিস রায়, যদিও আপনার নার্ভের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই-ই চাই। প্লিজ একটু কষ্ট করে জবাব দিন।

পাপিয়া যেন মিঃ সেনের কথা শুনতেই পায় নি বলে মনে হয়। অস্ফুট হাসির রেখা ঠোঁটে নিয়ে অমিতাভর দিকে চায়।

মিস রায়।

মিঃ সেন কি বলছেন শোন পাপিয়া।

অমিতাভ পাপিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিঃ সেনের প্রতি।

মিস রায়, আপনাকে শুভেনবাবুর বাড়ী থেকে কে নিয়ে গেছিল ? কোথায় ?

মিঃ সেন প্রশ্ন করেন।

পাপিয়া নীরবে বসে থাকে মিঃ সেনের দিকে চেয়ে।

বলুন, মিস রায়। দিস্ ইজ ভেরী ইম্পর্ট্যান্ট। বলুন! কি হ'ল ?

মিঃ সেন প্রশ্নের জবাবের আশায় পাপিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন আবার।

পাপিয়া নিঃশব্দে বসে থাকে! ঘাড়টি কাত করে একবার মিঃ সেনের দিকে চেয়ে অমিতাভর দিকে চায় বোবা দৃষ্টি মেলে।

বল পাপিয়া। অমিতাভ বলে।

বলুন মিস রায়। মিঃ সেন বলেন।

পাপিয়ার ঠোঁটটা একটু থরথর করে কেঁপে ওঠে শুধু। কথা ফোটে না। একটু যেন ভীত দেখায় তাকে।

মিঃ সেন পাপিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে বলেন—নার্ভ খুব উইক হয়ে গিয়ে সাডেন রেসকিউ হওয়াতে বোধ হয় এ রকম হচ্ছে। ষ্ট্রেইনও গেছে মনে হয়। ইমিডিয়েট ট্রিটমেণ্ট করবার বন্দোবস্ত করবেন। ওনাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। আমাদের ফিউচার এ্যাকশনে অনেক হেল্পফুল হবে ওনার ষ্টেটমেণ্ট।

তাহলে বাড়ীতে—

অমিতাভর অসমাপ্ত কথা টেনে নিয়ে বলেন মিঃ সেন—

সিওর। এখন খুব ক্লোজলি রিলেটেড লোকেদের কাছে থাকা উচিত। মিঃ রায় এলে অফিসিয়াল যা কিছু ব্যাপার চুকিয়ে, নিয়ে যেতে পারেন।

পাপিয়া তখন অমিতাভর কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ততায় যেন ঘুমিয়ে পড়বার উদ্যোগ করে। কিন্তু হঠাৎ চমকে মাথা তুলে চারিদিকে কিছু দেখে নিয়ে আবার চোখ বোঁজে।

মিঃ সেন পাপিয়ার এই ভাব-ভঙ্গীতে একটু চিন্তিত ভাবে অমিতাভর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন।

এমনি করে কাটল কিছু সময়। অমিতাভ রমেন্দ্রবাবুর আসার অপেক্ষায় বসে থাকেন।

পাপি—রমেন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকে গাঢ়স্বরে পাপিয়াকে ডাকেন।

পাপিয়া অমিতাভর কাঁধ থেকে মাথা তুলে রমেন্দ্রবাবুর দিকে

চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। আবার পাপিয়ার ঠোঁটটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। চোখের জলে দাগ কাটা গালে ছোট্ট দুটি ফোঁটা ঝরে পড়ে। সকরুণ অনেক কিছু বুঝি বলে চোখ দুটি।

এই কাঁদে না। বোকা মেয়ে।

পাপিয়াকে পাওয়া গেছে। নাটকীয় ভাবে। অতি নাটকীয় বলতে পারা যায়। অমিতাভর মনটা অনেকদিন বাদে সেই পুরোনো সুরে মেতে ওঠে। পাপিয়া নামটা কি সুন্দর? পিউ একটা সুন্দর পাখী।

পূজোর ঝিলিক যেন অনুভব করে অমিতাভ। চারিদিকে প্রস্তুতির শেষ পর্ব চলেছে। ছুটির গন্ধ নিয়ে দিনগুলো এগিয়ে চলেছে। মেজাজী একটা হাওয়া অমিতাভকেও আবিষ্ট করে। নিবারণকে চা দিতে বলে পুরোনো একটা ইজিচেয়ার টেনে তার উপর এলিয়ে পড়ে অমিতাভ। সন্ধ্যা তখন কলকাতা শহরের উপর নেমে পড়েছে। সারাদিনের উত্তেজনায় একটু ক্লান্তও মনে হয় নিজেকে।

আজ পাপিয়াকে পৌঁছে দেবার সময় অমিতাভ ভেবেছিল, সুষমা দেবী পাপিয়াকে দেখলে, তাঁর গত কয়েকদিনের মানসিক বিধ্বস্ত শরীরে হঠাৎ হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

কিন্তু পাপিয়া সুষমা দেবীকে দেখে পরম আশ্বাসে তাঁর বুকে মুখ লুকাতে সুষমা দেবী ওর মুখটি আস্তে আস্তে তুলে ধরেন। কাঁপা গলায় শুধু বলেন—আয়, মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নে। কি ছিরিই হয়েছে তোর।

নানু তার দিদির ফিরে আসায় কিছু না বলে খুশী মাখান চোখ নিয়ে পাপিয়ার দিকে চেয়েছিল। সেই ছোট্ট সাদা কুকুরটা কয়েক-দিনের অনুপস্থিতির পর পাপিয়াকে দেখে আনন্দ-মিশ্রিত লাফালাফি আর চীৎকার শুরু করে দেয়।

চল পাপিয়া।

সুষমা দেবী আবার বলেছিলেন।

হ্যাঁ, যা পাপি। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে বস তারপর। নান্টু, দিদিকে নিয়ে যাও।

নান্টু এগিয়ে গিয়ে পাপিয়ার হাত ধরে টানতে টানতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রমেন্দ্রবাবু উচ্চকণ্ঠে নান্টুর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন—নান্টু, তোর সেই কি যেন 'বিভীষণের হত্যাকাণ্ড' না কি বই আছে, দিয়ে যা। একটু দেখি কি রকম বই। যা সব বই পড়িস তোরা।

নান্টু পাপিয়াকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। সুষমা দেবীও তাদের অনুসরণ করেন।

অমিতাভ বলে—এবার আমি বাড়ী যাই।

এখনই উঠবে?

হ্যাঁ। আর ডাক্তারকে খবর দিন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডক্টর সিন্হাকে এখুনি খবর পাঠাচ্ছি। তুমি চা খেয়ে যাও অন্তত।

তা খাচ্ছি। মৃদু হেসে জানিয়েছিল অমিতাভ।

ডাক্তার সিনহা এসে পাপিয়াকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, মেন্টাল ষ্ট্রেইনে নার্ভ উইক হয়ে গেছিল। উপরন্তু সাডেন শকে এই অবস্থা হয়েছে। তবে রেষ্ট আর কেয়ারের মধ্যে থাকলে দু'এক দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

এখন ইজিচেয়ারে বসে, পুরোনো ঘটনাগুলোকে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে থাকে অমিতাভ। সে দিনের কথা। পাপিয়ার সঙ্গে প্রথম আলাপের রাতটি সেটিও যেন একটা গল্পকথার মতই মনে হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত—কি একটা যেন মনে হয় অমিতাভর—স্মাগলার দলের সঙ্গে শুভেনবাবুর সম্পর্ক কি ছিল—নাকি শুভেন-বাবুর নিজেরই ঐ নেশা ছিল।

ছোটবাবু, আপনার এক বন্ধু এসেছে।

নিবারণ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে অমিতাভর স্মৃতি রোমন্থনের মাঝে।

চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে অমিতাভ—কে এসেছে?

ঐ যে গো, সেই বৃষ্টির দিন যে এসেছিল।

নিবারণ জানায়।

একটু ভেবে নিয়ে অমিতাভ বলে—ওঃ, সুপ্রিয়। বুঝেছি। বাইরের ঘরে চা-টা দিয়ে আয়, বুঝলি।

আচ্ছা।

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

চা-টা তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে শেষ করে অমিতাভ। তারপর বাইরের ঘরের দিকে যায়।

কি রে, কি ব্যাপার? হঠাৎ, তোর উদয় যে!

অমিতাভ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুপ্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বলে।

তুই সেদিন যাবি বলেছিলি, তাই নিতে এলাম, চল।

সুপ্রিয় মৃদু হেসে বলে।

অমিতাভ প্রথমটায় বুঝতে পারে না যে কোথায় যাওয়ার কথা সে বলেছিল। মনে পড়তে বলে—

ও হোঃ, তোর পোলট্রি দেখতে ত।

হ্যাঁ। যেন আকাশ থেকে পড়েছিলি প্রথমে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে চল।

সুপ্রিয় সিগারেটটার ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে।

আজই—একটু কুন্ঠিত হয় যেন অমিতাভ।

হ্যাঁ আজই।

যাব। তবে ভাই আজকে নয়। আরেক দিন।

কেন?

আজ একটা এনগেজমেণ্ট আছে।

কারণটা জানায় অমিতাভ।

তবে থাক। আবার যেদিন যাব, সেদিন না হয় যাস। আর মনে না থাকলে দোষ দিস না যেন।

সুপ্রিয় হাসতে হাসতে বলে।

আমিই না হয় মনে করিয়ে দেব।

তাই করিস। আচ্ছা, আমি তবে উঠি। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।

সুপ্রিয় বলে। একটু পরে আবার বলে ওঠে—বাই দি বাই, তোর সেই মার্ডার কেসটার খবর কি?

আমার মার্ডার কেস!

সকৌতূকে বলে ওঠে অমিতাভ।

হেসে সংশোধন করে নেয় সুপ্রিয়—আরে না, না, তোর সেই পরিচিত ভদ্রলোক। মার্ডার হয়েছিলেন না?

হ্যাঁ—

ব্যাপারটার কিছু কনক্লুসনে এসেছে কি পুলিশ?

আমি ঠিক অত ডিটেইল জানি না ভাই। তবে দু' একদিনের মধ্যে একটা কিছু জানা যাবে।

অমিতাভ জবাব দেয়।

কি রকম?

একটু কৌতূহলে সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে।

পাপিয়াকে—

বাধা দিয়ে আবার বলে ওঠে সুপ্রিয়।

পাপিয়া?

হ্যাঁ। মানে পাপিয়া রায়। তুই ঠিক চিনবি না।

চিনব না বটে, কিন্তু বুঝতে পারব ত। যাই হোক, বল কি বলছিলিস।

পাপিয়াকে শুভেনবাবুর খুন হবার দিন মার্ডারার ওকে কিডন্যাপ করে।

ভেরি ইণ্টারেষ্টিং।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন পাপিয়াকে পাওয়া গেছে। অবশ্য মেন্‌টাল ষ্ট্রেইনে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অবস্থা বিচারে অবশ্য খুব একটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

পাওয়া গেল কি করে?

সকোতূহলী সুপ্রিয়র প্রশ্ন ভেসে আসে।

নাটকীয় ভাবে বলতে পারিস।

আচ্ছা, আচ্ছা, বল শুনি।

অমিতাভ ঘটনাটা আবার খুলে বলে।

সুপ্রিয় আরেকটা সিগ্রেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে বলে—

তাহলে এই ব্যাপার। মার্ডারটার কোন হদিস করা যায় নি তাহলে?

না। খুনী খুব সতর্ক লোক। যদিও দৈব একটু সহায় ছিল, তবু কোন ক্লু-ই বলতে গেলে রাখে নি সে।

একটা চ্যালেঞ্জ তাহলে বল।

সুপ্রিয় বলে ওঠে। তারপর একটু হেসে বলে—তাহলে পাপিয়া রায়—এঁ্যা। 'পিয়া লাগি বনে বনে ঢুরি'।

অনেকটা তাই।

মৃদু হেসে অমিতাভও জবাব দেয়।

আচ্ছা, এবার উঠি। সময় থাকলে দুজনে মিলে না হয় সখের গোয়েন্দাগিরি করা যেত। সময়ই নেই। আচ্ছা চলি।

সুপ্রিয় উঠে পড়ে। কিছুটা এগিয়ে থেমে গিয়ে বলে আবার— হ্যাঁ রে, তুই এবার কম্পিটিশন পরীক্ষা দিচ্ছিস না?

হ্যাঁ।

প্রিপারেশন কেমন হল?

এক রকম। তবে অঙ্কের পেপারটায় ভয় আছে।

ঠিক হয়ে যাবে। একটা অঙ্ক ত মিলতে চলেছে।

সকৌতুকে সুপ্রিয় বলে।

উঁ।

অমিতাভ বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারছিস না। একে একে দুই। দোঁহে মিলে এক। অঙ্কই ত।

হেসে ওঠে দু'জনে একসঙ্গে।

সুপ্রিয় হাসি থামিয়ে বলে—আজ একটা প্রোগ্রাম মনে মনে ঠিক করেছিলাম। না গিয়ে দিলি সব ভেস্তে। আচ্ছা, সো লঙ।

পরদিন সকাল। ঘড়িতে প্রায় এগারটা বাজে।

মিঃ সেন বিকাশের খুনটা একে একে সাজাতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু জোরালো কিছু পাচ্ছিলেন না, যাতে করে খুনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। শুভেনবাবুর আর বিকাশের খুনী এক লোক বলেই মনে হচ্ছে। রূপেনবাবু, শুভেনবাবুকে খুন করতে পারেন—কেন না, সন্তোষজনক জবাব তিনি দিতে পারেন নি। খুন হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন?

বিকাশের ব্যাপারে রূপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন মিঃ সেন। রূপেনবাবু তখন সকালের কাগজটা নিয়ে বসেছিলেন।

মিঃ সেন ঘরে ঢুকতে সবিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়েছিলেন রূপেনবাবু।

রূপেনবাবু বিকাশ ঘোষের খুনের খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন মিঃ সেন।

হ্যাঁ। মানে এই কাগজে পড়লাম আর কি।

হু। আচ্ছা রূপেনবাবু, কাল রাত সাতটা থেকে আটটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি—মানে—

একটু ইতঃস্তত করে তারপর বলে উঠেছিলেন রূপেনবাবু—দেখুন, আমার ব্যক্তিগত গতিবিধি আপনাকে বলব কেন?

সেটা আপনার অভিরুচি।

হ্যাঁ। আপনি ঠিক বলেছেন।

একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলেন রূপেনবাবু।

আচ্ছা রূপেনবাবু, আপনার হাতটা কাটল কিসে?

এ্যাঁ, মানে ভাঙা কাঁচ সরাতে গিয়ে।

হুঁ।

মিঃ সেনের সঙ্গে এরপর আর বিশেষ কথা রূপেনবাবুর হয় নি। কিন্তু শুভেনবাবুর অদ্ভুত উইলের কথা। হাতটা কি সত্যি ভাঙা কাচে কেটেছে?

এবার পাপিয়া রায়ের কাছ থেকে কিছু অন্ততঃ জানা যাবেই। মিঃ সেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন লালবাজার থেকে।

রমেন্দ্রবাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন মিঃ সেন। ড্রইং রুমে তখন অমিতাভ আর রমেন্দ্রবাবু বসে কথা বলছিলেন।

মিঃ সেনকে দেখে রমেন্দ্রবাবু বলে ওঠেন—আরে মিঃ সেন, আসুন, আসুন।

আমি প্রয়োজনের তাগিদে এলাম।

মিঃ সেন বলেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি ব্যাপার বলুন।

মিস রায় কেমন আছেন?

ভালো।

তাঁকে যদি একটু ডেকে দেবার ব্যবস্থা করেন। কয়েকটা প্রশ্ন করব। যেগুলো জানা ভীষণ দরকার।

নিশ্চয়ই। দেখবেন, যেন আবার স্ট্রেইন্ না পড়ে—

রমেন্দ্রবাবু অনুরোধ জানান মিঃ সেনের কথায়।

হ্যাঁ, সেটাও দেখব।

আচ্ছা, ঠিক আছে অমিতা, যাও ত—

অমিতা ?

মিঃ সেন একটু কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ। মানে এ আর কি—

রমেন্দ্রবাবু অমিতাভকে দেখিয়ে দেন।

মিঃ সেনের চোখে কৌতুকের ছায়া পড়ে। চাপা হাসির রেখা মুখে নিয়ে রমেন্দ্রবাবুকে বললেন—মিঃ রায়, একটা জলজ্যান্ত পুরুষকে অমিতা বলে ডাকবেন না।

এঁ্যা। হ্যাঁ ঠিক, ঠিক। অমিতাভ, পাপিকে ডেকে নিয়ে এস ত।

অমিতাভ আর মিঃ সেন মৃদু হাসি নিয়ে আবার দৃষ্টি বিনিময় করেন রমেন্দ্রবাবুর কথায়।

পাপিয়ার ঘরে অমিতাভ এসে দেখে পাপিয়া একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। অমিতাভর ঘরে ঢোকার শব্দে চোখ তুলে অমিতাভর দিকে চায়।

অমিতাভ কৌতুক ভরা গলায় বলে—চল, পুলিশ এসেছে।

কেন ?

তোমাকে দরকার। মিঃ সেন বসে আছেন। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়াব।

পাপিয়া হেসে বলে—চল।

পাপিয়া ঘরে ঢুকতে মিঃ সেন বলেন—

বসুন মিস রায়। শরীর কেমন আছে ?

ভালো।

ছোট্ট জবাব দেয় পাপিয়া।

কয়েকটা কথা আপনার কাছে আমার জানবার আছে।

মিঃ সেনের কথায় পাপিয়া আবার ছোট একটা জবাব দেয়—

বলুন।

আচ্ছা, তাহলে সময় নষ্ট না করে আসল কথাতে আসি।

মিঃ সেন একটু থেমে প্রশ্ন করেন—

আচ্ছা মিস রায়, যেদিন আপনি শুভেনবাবুর বাড়ীতে ছিলেন,.. সেদিন কি কিছু দেখেছেন?

না।

মাথা নেড়ে জানায় পাপিয়া।

কিছু শুনেছেন?

না।

আচ্ছা, কোন আওয়াজও পান নি?

ঠিক সে রকম কিছু নয়। তবে—

হ্যাঁ বলুন।

মিঃ সেন উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

আমি শুয়েছিলাম। চিনিকাকুর ঘর থেকে একটা কি রকম যেন আওয়াজ পেয়ে—

কি রকম আওয়াজ মিস রায়?

এই—এই ধরুন কিছু ধুপ করে পরার মত।

তারপর?

সেই আওয়াজ পেয়ে আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে চিনিকাকুর ঘরের সামনে আসতেই পেছন থেকে কে যেন একটা ভিজে রুমাল চেপে ধরে—তারপর আর কিছু মনে নেই।

কথাগুলো বলতে পাপিয়া যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

ক্লোরোফর্ম। তাহলে সব রকম প্রিপেয়াড হয়েই এসেছিল।

একটু থেমে আবার পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করেন—

কাউকে দেখেছেন?

না।

হু। কোথায় রেখেছিল বুঝতে পেরেছিলেন?

না। তবে ঘরটা একটু নতুন বলেই মনে হয়েছিল।

ও। আচ্ছা, ওখানে কাউকে দেখেন নি।

হ্যাঁ। একটা লোককে দেখেছিলাম।

সে কি? নাম জানেন?

সনাতন বলে ডাকতে শুনেছি।

সনাতন?

হ্যাঁ।

মিঃ সেন নামটা লিখে নেন।

আর কাউকে দেখেন নি?

একটা মেয়েলোক খাবার দিয়ে যেত।

তার নাম?

নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

মনে করার চেষ্টা করুন মিস রায়। একটু চেষ্টা করুন।

উদগ্রীব হয়ে বলেন মিঃ সেন।

মানে—

চেষ্টা করতে থাকে পাপিয়া মনে মনে। হঠাৎ বলে ওঠে—

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কমলা।

কমলা!

হ্যাঁ।

এ নামটাও লিখে নেন মিঃ সেন। একটু উৎসাহিতও বোধ করেন।

আচ্ছা, যেদিন শুভেনবাবুর বাড়ীতে ছিলেন, সেদিন কারো আসার কথা জানতেন?

না। চিনিকাকু এ রকম ভাবে—

অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পরে পাপিয়া। কিন্তু একটু পরেই সামলে নেয়।

মিঃ সেন প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, মিস রায়, তাদের সঙ্গে

আপনার কথা হয় নি। মানে আপনাকে যারা আটকে রেখেছিল তাদের সঙ্গে?

হ্যাঁ। সনাতন জিজ্ঞেস করত, চিনিকাকুর ঘরে সেদিন কাউকে দেখেছি কিনা? কে গেছিল তার নাম? কাউকে আসতে দেখেছিলাম কিনা? সনাতনকে চিনি কিনা? এই সব জিজ্ঞেস করত।

একটু হাঁপায় যেন পাপিয়া।

হু। আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে যে, আপনি কাউকেই সন্দেহজনক আওতায় সনাক্ত করতে পারবেন কি না।

আর—

পাপিয়া আরও কিছু মনে পড়তে বলে ওঠে যেন।

হ্যাঁ বলুন। মিঃ সেন বলেন।

নারুবাবুর নাম ওদের আলোচনার মাঝে শুনেছি। কিন্তু লোকটাকে দেখিনি কোনদিন।

নারুবাবু—দলের মেইন কালপিট হতে পাবে।

মিঃ সেন মৃদু হেসে বলেন। তারপর আবার জিগ্যেস করেন—

আচ্ছা, মিস রায়, দরকার হলে পরে আসব। আপনি এবার আসতে পারেন।

পাপিয়া মিঃ সেনের কথায় উঠে দাঁড়ায়।

রমেন্দ্রবাবু বলেন—

পাপি, তোমার ওষুধ খাবারও ত সময় হয়েছে। খেয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক গে।

পাপিয়া ভেতরে চলে যেতে যেতে থেমে পড়ে অমিতাভকে বলে—

তুমি কি চলে যাবে?

না, কিছুক্ষণ আছি। অমিতাভ জবাব দেয়।

যাবার সময় দেখা না করে চলে যেও না যেন।

পাপিয়া ভেতর দিকে চলে যায়।

রমেন্দ্রবাবু বলেন—মিঃ সেন, একটু চা খান।

বাহাত্বরকে ডেকে চা এর কথা বলে দেওয়া হয়।

মিঃ সেন চিন্তিত মনে জিজ্ঞেস করেন রমেন্দ্রবাবুকে—আচ্ছা, মিঃ রায়, শুভেনবাবুর পার্টনার রূপেনবাবুর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

রমেন্দ্রবাবু একটু ভেবে নিয়ে বলেন—

বিশেষ কিছু জানি না। তবে শুভেনের মুখে শুনেছি, লোকটা নেশাখোর, আর টাইপটাও ভিসিয়াস্।

মিঃ সেন অনেকটা নিজের মনেই শেষ কথাটির পুনরোক্তি করেন—ভিসিয়াস্।

এখন···

···রাত্রি তখন জমাট বাঁধা অন্ধকারে অনেকটাই হয়েছে। মিঃ সেন লালবাজারে তাঁর অফিস ঘরে চিন্তা করছিলেন একমনে। তলিয়ে দেখতে চাইছিলেন সমস্ত ব্যাপারটাকে।

পাপিয়া রায় নামগুলো ছাড়া বিশেষ কিছুই জানাতে পারেন নি। তবে সেটুকুরও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সনাতন মণ্ডল—নামটা সাধারণ। পুলিশ-চক্ষুর আওতায় ও নামটা বা লোকটার কোন উপস্থিতি কখনও ঘটেনি। তবু চেষ্টা করে লোকটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

কমলা—এই মহিলার অবস্থিতি কোথায়। সেটাও জানা দরকার। অপরাধের সঙ্গে এর সাহায্যকারী হিসেবে জড়িত। এ কেসটার শেষ টেনে আনতে ছ'জনের প্রয়োজন।

নারুবাবু—সে কে? খুব সম্ভব আসল লোকটি এই নারুবাবু। কিন্তু তার সত্যিকারের পরিচয়টা কি? কি সে কারণ, যার জন্যে শুভেনবাবু এবং বিকাশকে খুন করেছে? ব্ল্যাকমেইলিঙ এবং স্মাগলিঙের কারণ কি এর সঙ্গে জড়িত?

রূপেনবাবু—তিনিই কি নারুবাবু? রূপেনবাবুর গতিবিধি একটু রহস্যজনক। আজ সন্ধ্যা থেকে তিনি একটা লোকের সঙ্গে রয়েছেন—একটু আগে খবর পাওয়া গেছে, রূপেনবাবু তখনও আছেন সেই লোকটির সঙ্গে। এই লোকটির সঙ্গে রূপেনবাবুর সম্পর্ক কি? বিশেষ করে ঐ লোকটি নানা কারণে পুলিশের সন্দেহ সৃষ্টিকারী।

শুভেনবাবুর ঘরে সোনার টুকরো আর কোকেন এল কোথা থেকে? সোনা—ধরে নেওয়া গেল শুভেনবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু কোকেন? তিনি কি কোকেনের নেশা করতেন? নাকি আইনের চোখে ধুলো দিয়ে কোকেনের চোরা ব্যবসা করতেন? কিম্বা অন্য কোন উপায়ে তাঁর কাছে ওটা এসে পড়েছিল?

বিকাশের খুন, শুভেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গেই জড়িত। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটা কথা বোঝা যাচ্ছে, বিকাশ তাকে ব্ল্যাক-মেইল করছিল। সে একজন ব্যবসায়ী। বিকাশের মৃত্যু সম্পর্কিত পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে যে, বিকাশের বাঁ পাঁজরে ছোরার আঘাত হৃদযন্ত্র ভেদ করে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে। খুনী ডান হাতে ছোরা চালিয়েছে এবং হঠাৎ। ব্যবসায়ীটি কে?

মিঃ সেন সেই ছেঁড়া ওয়াটার প্রুফের অংশটির ল্যাবরেটারি রিপোর্টটা মনে করতে চেষ্টা করেন—হ্যাঁ। এ্যালকোহলের চিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে। সুতরাং লোকটার অভ্যাস সম্বন্ধে একটা তথ্য জানা গেছে। তবে সনাতন মণ্ডলই কি শুভেনবাবুর বাড়ীতে খুনের সময় উপস্থিত ছিল? কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? নামের মানুষ দুটোকে সম্মুখে হাজির করা দরকার।

আজ ডি. সি. সুভাষরঞ্জন গুপ্ত, মিঃ সেনকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—সেন, আই হ্যাড হোপ অন ইউ। শহরে দু-দুটো খুন হয়ে গেল, কিন্তু খুনীকে ট্রেস করা গেল না। কেন?

ডি. সি.র কথায় মিঃ সেন নীরবে থেকেছেন। জবাব দেওয়ার

চেষ্টা করেন নি। মনে মনে শুধু প্রতিজ্ঞা করেছেন—এ ব্যাপারটার মীমাংসা তিনি করবেনই।

সেই থেকে ভারাক্রান্ত মনে মিঃ সেন ভেবে চলেছেন—মিস রায়ের ডিসএ্যাপিয়ারেন্স সম্বন্ধে দু দিক দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিলেন মিঃ সেন। খুনেব জন্যই গুম করা হয়েছিল? নাকি, গুম করার জন্য খুন? কিন্তু ব্যাপারটা এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—খুনের জন্যই গুম করা হয়েছিল।

কিন্তু আবার একটা কথা মিঃ সেনের মনে ভেসে আসে—পাপিয়া রায়কে খুনী তাহলে একেবারে সরিয়ে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল কেন? আর এ ভাবে—

মিঃ সেন তাঁর সামনে পড়ে থাকা প্যাডের কাগজে অন্যমনস্ক ভাবে লিখতে থাকেন—

১। কালো রঙের গাড়ী।—কি নাম গাড়ীর মডেলটার?

২। ডাবলিউ. বি. নয় নয়—। বাকী সংখ্যাটা কত?

৩। বিকাশকে লেখা চিঠি। কে লিখেছিল?

৪। বিকাশের লেখা চিঠি। কাকে লেখা?

৫। ছেঁড়া ওয়াটার প্রুফে এ্যালকোহলের চিহ্ন। সনাতন মণ্ডলের কি?

৬। সোনা ও কোকেন। কোথা থেকে এল এবং কেন?

৭। বিকাশের সম্পর্ক। কতখানি?

৮। সনাতন।—কে? ঘটনাগুলির সঙ্গে কতখানি জড়িত?

৯। কমলা।—ঐ।

১০। নারুবাবু।—আসল পরিচয় কি?

১১। রূপেনবাবুই কি নারুবাবু? রূপেনবাবু ব্যবসায়ী।

১২। রূপেনবাবুকে পাপিয়া রায়ের নিরুদ্দেশ সংবাদ কে দিল, গোপনতা সত্ত্বেও?

১৩। রূপেনবাবুর হাত কিসে কাটল?

মিঃ সেন কাগজটির দিকে চেয়ে বসে থাকেন একই ভাবে। মনে মনে যেন সব প্রশ্নের জবাব ঠিক করে নিতে থাকেন।

সেন।

ডাকে চমক ভাঙে মিঃ সেনের। চেয়ে দেখেন মিঃ বাগচী দাঁড়িয়ে আছেন সম্মুখে। মিঃ বাগচী সামনে পরে থাকা কাগজটা তুলে ধরেন কৌতূহলে।

পড়ে নিয়ে বলে ওঠেন মিঃ বাগচী—হুঁ। পয়েণ্টসগুলো ভালোই সাজিয়েছ। এগুলোর জবাবে তোমার সলভ্ লুকিয়ে আছে। ট্রাই হার্ড মাই ডিয়ার ইয়ঙ ম্যান।

আমি সেই চেষ্টাই করছি স্যার। জীবনে প্রথম কেস হ্যাণ্ডেল করছি। হারব না।

দৃঢ়কণ্ঠে বলেন মিঃ সেন।

দ্যাট শুড বি দি স্পিরিট।

মিঃ বাগচী উৎসাহ দিয়ে বলে ওঠেন।

ঘরের আলোয় মিঃ সেনের চোখটা চকচক করে ওঠে। উর্ধ্বতন একজনের উৎসাহিক কথায় যেন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে তাঁর শরীর।

আচ্ছা, এবার উঠে পড়, একটু রেষ্ট নিয়ে নাও।

হ্যাঁ স্যার, যাচ্ছি। কিন্তু নিতাইদের দল কখন কি ম্যাসেজ পাঠাবে, তার ঠিক নেই। তাই—

মিঃ সেনের কথায় বাধা দিয়ে বলেন মিঃ বাগচী—না, না, তুমি যাও। আমি আছি। ডোণ্ট ওরি। আমি না থাকলেও বলে যাব। খবর যদি কিছু আসে, সেটা যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান হয়।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গুড নাইট।

গুড নাইট।

আস্তে আস্তে অফিস থেকে বেরিয়ে মিঃ সেন তাঁর কোয়ার্টারের পথে পা চালিয়ে দেন। চিন্তা ও পরিশ্রমে একটু ক্লান্ত মনে হয় মিঃ সেনের।

ক্রিরি···রি···রি···রিঙ। ক্রিরি···রি···রি···রিঙ। ক্রিরি··· রি···রি···রিঙ।

রাত্রির নিঝুম পরিবেশে টেলিফোনটা তীক্ষ্ণ যান্ত্রিক আওয়াজ তোলে। মিঃ সেন তাড়াতাড়ি উঠে বসেন বিছানায়। ঘুম ভাঙা চোখ কুঁচকে ঘড়িটা দেখার চেষ্টা করেন রাস্তা থেকে ছিটকে আসা আলোয়। ঘড়িতে তখন তিনটে। টেলিফোনটা হাত বাড়িয়ে তুলে ধরেন মিঃ সেন।

হ্যালো।

হ্যালো, সেন? আমি ইনস্পেক্টর বাগচী কথা বলছি।

মিঃ বাগচী? জরুরী কোন খবর এসেছে কি?

হ্যাঁ।

বলুন স্যার। মিঃ সেন বলেন।

শোন সেন, তুমি একবার অফিসে চলে এস এখুনি। কারণ, মেরিণ ক্লাবের সামনে আবার একটা খুন হয়েছে বলে খবর এসেছে। ডি. সি. আমাকে যেতে বলেছেন—তুমিও চল।

আচ্ছা স্যার। আমি আসছি এখুনি।

তাড়াতাড়ি এস।

হ্যাঁ।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে সমস্ত জড়তা ভেঙে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নেন মিঃ সেন।

মিঃ বাগচী আর মিঃ সেনেদের দল নিয়ে জীপটা যখন ঘটনাস্থলে পেঁৗছল, তখন ঘড়িতে ঠিক তিনটে কুড়ি মিনিট হয়েছে।

তখন নির্জন গঙ্গার পারে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো নোঙর ফেলে আলোর মালা গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকাগুলিতে আস্তে আস্তে ব্যস্ততার আভাস বাড়ছে। বিরাট এই রাস্তাটায় তখনও রাত্রির ঝিমধরা নির্জন, শান্ত আবহাওয়া। সেই রাস্তার বাঁকের

মুখে হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের দল।

গাড়ী থেকে নেমে মিঃ বাগচী, মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান মৃতদেহের উদ্দেশ্যে। মিঃ সেন, তাঁর হাতের শক্তিশালী টর্চবাতিটা জ্বেলে নেন।

টর্চের আলোয় ভালো করে দেখা গেল একটি শায়িত দেহ। রোগা চেহারা। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। খালি পা। একটি শার্ট ও পায়জামা পরনে।

মিঃ সেন এক পলক দেহটা দেখে নিয়ে চারিদিকে টর্চটার আলো ফেলে দেখে নিতে থাকেন। জায়গাটার স্বপ্নালোকিত নির্জন পরিবেশ অজ্ঞাত নয়। এই কারণে খুন জখম, রাহাজানির বদনাম অনেক আগে থেকেই রয়েছে। মেরিন ক্লাবের সামনে একটি বাতি জ্বলছে। কিছুদূরে গঙ্গার পারের কাছে কি একটা মিঃ সেনের দৃষ্টি পথে আসতে, তিনি সে দিকে এগিয়ে যান।

একটি রুমাল। তার সামনে একপাটি চটি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মৃত লোকটি এইখানে বসেছিল। সিগ্রেটের কয়েকটি টুকরো ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে। মিঃ সেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি টুকরো হাতে তুলে নেন। সস্তা দরের সিগ্রেটেব তামাক দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু এই সিগ্রেট গোল্ডফ্লেক ব্র্যাণ্ডের।

পর্য্যবেক্ষণ করে মিঃ সেনের এইটুকু ধারণা হয় যে, মৃত লোকটির সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি লোকের উপস্থিতি ঘটেছিল। খুব সম্ভব এই দ্বিতীয় লোকটিই খুনী।

মিঃ সেন সেখান থেকে উঠে দাঁড়ান। মিঃ বাগচী মৃতদেহটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নিরীক্ষণ করছিলেন। মিঃ সেনকে আসতে দেখে মিঃ বাগচী বললেন—

কি সেন, কিছু পেলে ওদিকে ?

আরেকজন কেউ ছিল স্যার।

মিঃ সেন, তাঁর পর্য্যবেক্ষণ করা অভিমত জানান।

কি করে বুঝলে ?

ভিক্টিম ঐ জায়গাটায় বসেছিল।

মিঃ সেন জায়গাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন, তারপর আবার বলেন—ত্ব'রকম সিগ্রেটের চিহ্ন পেয়েছি। আর রুমাল আর জুতো ফেলে কোন কথা বলতে বলতে এতখানি এসেছিল।

হুঁ।

মিঃ সেন তীক্ষ্ণ চোখে মৃতদেহটিকে দেখতে থাকেন, বাঁ পাঁজরে ছোরার আঘাত করা হয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। শরীরের সেই স্থানের বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে মিঃ সেন বললেন—

আর স্যার, মুখ দেখে মনে হচ্ছে এ্যাটাকটা এক্সপেক্ট করেনি ও।

রাইট। আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।

মিঃ বাগচী, মিঃ সেনের কথায় সমর্থন জানিয়ে বললেন।

তাঁদের কথার মাঝে স্থানীয় থানার অফিসার ইন্‌চার্জ মিঃ গাঙ্গুলী এগিয়ে আসেন। মিঃ বাগচী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

গাঙ্গুলী, এ ঘটনাটা তোমাকে জানাল কে ?

এই ক্লাবেরই নাইট ডিউটির দারোয়ান।

অফিসার ইন্‌চার্জ মিঃ গাঙ্গুলী জবাব দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁক দেন—এই দারোয়ান, ইধার আও।

দারোয়ানটি এগিয়ে আসে তাঁদের কাছে। মিঃ গাঙ্গুলী, মিঃ বাগচীকে জানান—হিয়ার হি ইজ বাগচী। যা জানবার জেনে নাও।

তুমিই জিজ্ঞাসাবাদ কর। তোমাকে ত ওর সাক্ষ্য নিতেই হবে।

মিঃ বাগচীর কথায় অফিসার ইন্‌চার্জ গাঙ্গুলী গম্ভীর গলায় খাঁকী পোশাক পরা মেরিন ক্লাবের চিহ্ন দেওয়া নেপালী দারোয়ানটিকে প্রশ্ন করেন—

তোমার নাম বল।

জং বাহাদুর সাব।

একে তুমি চেন?

নেপালীটি একপলক পিছন ফিরে মৃতদেহটাকে দেখে নিয়ে বলে—না সাব।

তুমি কখন দেখেছ ব্যাপারটা?

হাম সাব কোঠরীমে বৈঠা রহা। এহি আঢ়াই, পৌনে তিন বাজে হাম কোঠরীসে নিকল আয়া তো এক মোটর গাড়ী ওহি বকতমে চলা গিয়া।

মিঃ বাগচী বলেন—তারপর।

তো সাব, ভিতরমে রউণ্ড দেনে কো বাদ ইধর দেখা—কই শুয়া হ্যায়।

এক সুরে নেপালীটি বলে যায়—

তো হাম সোচা কি কই দারু ইরু পিকে ইঁহা গির গিয়া। এইসা ত সাব হরবকত হোতা। সব কই দারুউরু পিকে—

মিঃ গাঙ্গুলী 'দারু উরু পিয়া' লোকেদের ইতিহাসে উৎসাহ বোধ না করে বলে ওঠেন—

তারপর কি হল, বল। ও সব কথা ছেড়ে দাও।

হাঁ সাব। তো হাম সোচা কি কই ছিনতাই উনতাই কর লেগা ইসকো। তো, হাম হাঁক লগায়া, তব ভি কুছ নেহী বোলা। ফিন হাঁক লাগায়া। তব ভি কুছ নেহী বোলা। তো হাম নিকল আয়া, অউর উনকো বোলা—এই উঠো। তব ভি কুছ নেহী বোলা। তো হাম উনকে পর টরচ মারা তো—

কি রকম ভাবে পড়ে থাকতে দেখেছ?

যেইসে আভি হ্যায়। দেখনে কো বাদ পোলিশকে টেলিফুঁ কর দিয়া।

তুমি এখানে কাউকে আগে বসে থাকতে দেখ নি?

জী নেহী। কোঠরীসে রাতমে দো একবার নিকলতা দেখনে কে লিয়ে সাব। উসি বকতমে কই ভি নজর মে নেহী আয়া।

মিঃ বাগচীর কথার পরেই মিঃ গাঙ্গুলী প্রশ্ন করেন—

তুমি এখানে ক' বছর কাজ করছ।

তো সাব দশ বার বরস হুয়া।

আর কিছু জানার আছে বাগচী ?

মিঃ গাঙ্গুলীর কথায় মাথা নেড়ে মিঃ বাগচী না করেন।

আচ্ছা যাও।

অনুমতি পেয়ে জং বাহাদুর চলে যায়।

মিঃ সেন চারিদিকে আবার টর্চের আলো ফেলে পর্যবেক্ষণ করতে করতে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন। হঠাৎ মিঃ সেন বলে ওঠেন—স্যার!

কি হল সেন ?

মিঃ বাগচী, মিঃ সেনের এই চকিত ডাকে প্রশ্ন করেন।

একটু এদিকে আসুন।

মিঃ বাগচী এগিয়ে আসতে, মিঃ সেন আঙুল নির্দেশ করেন—পেট্রলের দাগ। ফোঁটা ফোঁটা করে অনেকখানি সেই জায়গাটিতে পড়েছে।

ইয়েস ?

মিঃ বাগচী সোৎসুক কণ্ঠে মিঃ সেনের দিকে চেয়ে বলেন।

এই দাগটা স্যার আপনার ষ্ট্রাইক করছে না ? আগের একটা ঘটনায় গুরুত্ব দেই নি। কিন্তু আবার একই ভাবে—

কো ইন্সিডেন্টালও হতে পারে। যাই হোক, আমার একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে।

মিঃ বাগচী ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তিতস্বরে বলেন।

আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার।

মিঃ সেনের কথা শেষ হতে না হতেই মিঃ বাগচী যেন অনেকটা

নিজের মনে বলেন—যদি তাই হয়। শুভেনবাবুর খুন হওয়ার দিন বৃষ্টিতে কুকুরটাকে ইউজ করতে পারি নি। সেকেণ্ড ইন্সিডেন্টে আমরা স্থির ভাবে জানতাম খুনীর গাড়ীকে ট্রেস করতে পারব না তাছাড়া ভিক্‌টিমও আমাদের জানা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিক্‌টিমকে জানি না আমরা। ঠিক আছে সেন, তুমি এখুনি টেলিফোন করে কুকুরটাকে আনতে বল—রাস্তায় জল দেওয়ার আগে—একটা চান্স নেওয়া যাক। তাড়াতাড়ি যাও, হাতে বেশী সময় নেই।

ওদিকে যথাবিহিত কর্তব্য সম্পন্ন হচ্ছিল। মর্গের গাড়ীটা এ সময়ে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার নেমে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে থাকেন। মিঃ সেন দ্রুত মেরিণ ক্লাবের ভিতরে চলে যান টেলিফোন করতে।

মিঃ সেন টেলিফোনে কুকুরটি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসার কথা বলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, ডাক্তার তাঁর পরীক্ষা সবে শেষ করেছেন।

ডাক্তার জানালেন যে, মৃত্যু পৌনে ছটো থেকে আড়াইটার মধ্যে ঘটেছে। মৃত লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেছে। ছোরার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য, রিপোর্টে ভালো করে সে সব তিনি জানাবেন।

মিঃ সেন মৃতের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেন। বিশেষ কিছুই বেরোয় না। পানামা সিগ্রেটের প্যাকেটে তিনটে চার্মিনার। একটা ব্যাগ মার্কা অর্ধেক খালি দেশলাই। কতকগুলো খুচরো পয়সা। ছটো বিড়ি—তার একটি ভেঙে গেছে। বাসের টিকিট। একটা দাঁত ভাঙা রবারের কালো চিরুনি। আর সুতলিতে বাঁধা একটা চাবি।

মিঃ বাগচী ইতিমধ্যে বাহাছুরকে ডেকে গাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করেন। তার জবাবে জং বাহাছুর জানায় যে, একটি কালো রঙের গাড়ীকে সে দেখেছে এবং কজন ছিল তা সে খেয়াল করে নি।

মিঃ বাগচী চিন্তিত মুখে মিঃ সেনের দিকে এগিয়ে এসে বলেন—

সেন, একটু পরে রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হবে, ভয় হচ্ছে জ্যাকি স্মেল না মিস করে তার জন্যে।

মিঃ সেন কিছু বলেন না। দুজনে অপেক্ষায় থাকেন।

দূরে একটা গাড়ীর হেড লাইটের আলো দেখা যায়। সেটা এসে তাদের সামনে থেমে যায়। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নেমে পড়েন জ্যাকির শিক্ষক মিঃ তলাপাত্র এবং জ্যাকিকেও গাড়ী থেকে নামান। তারপর বিরাট একটি দড়ি বাকলসের সঙ্গে সংযোগ করে দেন।

মিঃ বাগচী, মিঃ তলাপাত্রকে নির্দেশ দিতেই মিঃ তলাপাত্র জ্যাকিকে মৃতের দেহটির এবং পরে থাকা চটিটির ঘ্রাণ নিতে নির্দেশ করেন। জ্যাকি প্রথমে ঘ্রাণটি নিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে নেয় একবার। তারপর মাটিতে নাক ঠেকায়। সেইভাবে প্রথমে একই জায়গাটুকুর মধ্যে ঘুরপাক খায়। তারপর রুমালটি যেখানে পাতা ছিল সেই পর্যন্ত যায়।

হাওয়া যেদিক থেকে বইছিল, সেদিক থেকে পুলিশের লোকজন সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জ্যাকি আবার ঘুড়ে এসে ফুটপাথের কিনারে এসে থেমে যায়। এদিকে ওদিক চায় আবার।

তবে কি ওরা গাড়ীতে এসেছিল? মিঃ সেন মনে মনে ভাবেন। নাঃ, জ্যাকি আবার মুখ নামিয়েছে। গন্ধের রেশ আবার ধরতে পেরেছে তার ঘ্রাণশক্তি দিয়ে। আস্তে আস্তে জ্যাকি যেন একটা অদৃশ্য রেখা ধরে এগুতে থাকে। দ্রুততা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে যেন। মিঃ তলাপাত্র তাঁর হাতের দড়ি একটু ছেড়ে দেন।

মিঃ সেন সুতলীতে বাঁধা চাবিটা নিজের কাছে রেখে দেন। মিঃ বাগচী, অফিসার ইনচার্জ গাঙ্গুলীকে যথাকর্তব্য করতে বলে জ্যাকির সঙ্গে এগিয়ে চলেন মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে।

জ্যাকি তখন বেশ দ্রুত এগোতে থাকে মাটীতে গন্ধের রেশ নাকে নিতে নিতে। ডাইনে মেরিন ক্লাবকে ফেলে জ্যাকি এগোতে থাকে। মিঃ তলাপাত্র তাঁর হাতে ধরা দড়ি আর একটু ছাড়েন।

জ্যাকি মাঝে মাঝে রাস্তায় নেমে যায় এবং আবার ফুটপাথ ধরে চলে। মিঃ বাগচী ও মিঃ সেন সোৎসুক চোখে জ্যাকিকে দেখতে থাকেন।

জ্যাকি ক্রমশঃ লোকালয়ের দিকে ঢুকতে থাকে সেইভাবে—ক্রমে বসতি আরও ঘন হয়। একটা মোড়ের মাথায় এসে জ্যাকি থেমে যায়—এদিক ওদিক ঘোরে। তারপর আবার চলতে শুরু করে ডান দিকে বেঁক নিয়ে। আবার এক জায়গায় এসে জ্যাকি যেন গন্ধের রেশ খুঁজতে ছটফট করতে থাকে।

মিঃ সেন জায়গাটির চারি পাশে ভালো করে চেয়ে দেখেন। একটি পানের দোকানের সামনে জ্যাকির অস্থিরতার প্রকাশ দেখে মিঃ সেন ভেবে নেন যে, এখানে লোকটি পান বা সিগ্রেট খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল।

জ্যাকি লম্বা ঘুরপাক খেয়ে নিয়ে হঠাৎ একটা কিছু পেয়ে গিয়ে যেন আগের মত দ্রুত এগোতে থাকে।

অনেক লোকের কর্মব্যস্ততা শুরু হয় ভোর হওয়ার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা অবাক চোখে চেয়ে থাকে মিঃ সেনের দলের দিকে। আকাশে সামান্য আলোর প্রলেপ পড়েছে পূবদিকে—আকাশের তারাগুলোকে একটু বেশী উজ্জ্বল মনে হয়।

জ্যাকি এসে একটি বস্তির সামনে থেমে যায় একটু। এদিক ওদিক শুঁকে নিয়ে বস্তীর ভেতরে ঢোকার সঙ্কীর্ণ গলিটা ধরে চলে। এখানেও তখন জেগে ওঠার পালা শুরু হয়েছে। রাস্তার পাশে করপোরেসনের জলের কলে বালতির লাইন পড়ে গেছে। দু'একজন স্নান করবার জন্যেও বেরিয়ে পড়েছে। জ্যাকি এবং মিঃ সেনদের দেখে তারা বিস্মিত এবং কৌতূহলী হয়ে দেখতে থাকে। জ্যাকি আস্তে আস্তে একটা ঘরের সামনে এসে থেমে যায়। মিঃ তলাপাত্রর দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে বন্ধ দরজাটা ঠেলতে থাকে। মিঃ তলাপাত্রর নির্দেশে সে কাজে ক্ষ্যান্ত হয়ে বসে পড়ে।

মিঃ বাগচী তাঁদের পিছন পিছন আসা লোকগুলির দিকে চেয়ে হেঁকে বলেন—আমরা পুলিশ। এ ঘরে কে থাকে?

লোকগুলি নীরব থাকে। সাহস করে কেউ যেন কিছু বলতে চায় না। কাঁধে গামছা নিয়ে স্নান করতে যেতে প্রস্তুত এমন একটি লোক এগিয়ে এসে বলে—আজ্ঞে, এ ঘরে সোনা মণ্ডল থাকে।

সে এখন কোথায়?

জানি না স্যার। কাল রাতে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি।

হুঁ। তুমি এখানে দাঁড়াও, চলে যেও না কোথাও।

মিঃ সেন দরজাটার তালায় তাঁর আনা চাবিটা লাগিয়ে ঘোরাতেই তালাটা খুলে যায়। দরজা খুলতে এক ঝলক ঝাপসা বাতাস বদ্ধ ঘরটা থেকে বেরিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত বাদে মিঃ বাগচী এবং মিঃ সেন ঘরের ভেতরে ঢোকেন। মিঃ সেন টর্চটা জ্বেলে ছোট জানলাটা খুলে দেন। একটু একটু করে আলো ফুটছে আকাশে তখন। খোলা জানলা পেয়ে কিছু আলো ঘরে ঢোকে। তবু টর্চ ব্যবহার করেন দুজনে।

মিঃ সেন আলোটা ঘরের চারিদিকে ফেলেন এবং ভালো করে ঘরের অবস্থা লক্ষ্য করতে থাকেন। ঘরটায় আছে—এক কোণে একটা গলা ভাঙা কুজো—নারকেলের ভাঙা খোলার ঢাকনি তার উপর। একটু এপাশে ফুল আঁকা একটি টিনের বাক্স। তার পাশে একটা বিছানা চট দিয়ে মুড়ে গুটিয়ে রাখা। রাস্তার পাশে বিক্রী হওয়া কোন এক চিত্রতারকার জীর্ণ ছবি দেওয়ালে আঁটকান। তারই পাশে কালীর ছবি দেওয়া একটি ক্যালেণ্ডার। একটা রঙ চটেযাওয়া মীটসেফ। তাতে কিছু জিনিষ গাদা করে ঢুকিয়ে রাখা আছে। মীটসেফটার উপরে একটা থালা আর গ্লাস—পাশে একটা ছোট্ট উনান, হাড়ী, একটা ছোট কড়াই আর হাতা সাজান। এ পাশে পেরেক আঁটকান দুটো ময়লা সার্ট আর পাঞ্জাবী। কোণাকুনি বাঁধা দড়িটাতে একটা প্যাণ্ট আর ধু

ঝোলান। আরেক কোণে কয়েকটা ভাঁড় পড়ে আছে—তার সামনে দুটো খালি দেশী মদের বোতল।

ভালো করে ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার পর মিঃ সেন টিনের বাক্সটার দিকে এগিয়ে যান। বাক্সটা খুলে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। কয়েকটি নতুন জামা কাপড় ইস্ত্রী করে রাখা আছে।

মিঃ বাগচী পেরেকে ঝোলান জামার পকেট দেখছিলেন। দড়িতে ঝোলান প্যাণ্টের পকেট দেখার পর, মিঃ সেন উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করেন—স্যার, কিছু পেলেন ?

গম্ভীর ভাবে মিঃ বাগচী জবাব দেন—হ্যাঁ।

কি স্যার ?

এগুলি।

মিঃ বাগচী মুঠি খুলে মিঃ সেনকে দেখান—কয়েকটা পয়সা। দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হেসে ওঠেন।

পয়সা কটা মিঃ বাগচী প্যাণ্টের পকেটে রেখে দেন আবার। দুজনে মীটসেফটার দিকে এগিয়ে যান। মীটসেফটা খুলতেই একটা দরজা হরাস করে খুলে পড়ে যায়।

মিঃ সেন নীচু হয়ে ভিতরের দিকে হাত বাড়ান। প্রথমেই একটি বোতল বেরিয়ে আসে। সেটি দামী বিদেশী মদের বোতল—একটু তরল পদার্থ তখনও তাতে আছে।

মিঃ বাগচী দেখে বলেন—বেশ, এক্সপেনসিভ ড্রিঙ্ক করত ত লোকটা।

মিঃ সেন এবারে বার করেন গুটিয়ে রাখা পুরানো একটা গরম কোট। তারপর বেরোয় একে একে টিনের বাক্স, ছেঁড়া মানিব্যাগ খালি শিশি, ছেঁড়া দু'চারটে বাংলা বই, পুরানো কাগজের বাণ্ডিল নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটা বাঁধান বহু পুরান হলদে হয়ে যাওয়া ফটো—যেটাতে কাউকে ভালো করে চেনার উপায় নেই। ছেঁড়া কাপড়ের বাণ্ডিল। অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বোঝা।

নীচের থাকে হাত দিতে বেরোয় বড় একটা নতুন চট। তারপর দুটো ছেঁড়া চটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটা পলিথিনের ওয়াটার প্রুফ এক জায়গায় কেটে গেছে।

মিঃ বাগচী দেখে সকৌতুকে বলেন—লোকটার ভীষণ পুরাতন প্রীতি ছিল ত। একেবারে মিউজিয়ম বানিয়ে রেখেছে। দেখ সেন, আরো মূল্যবান কিছু পাও কিনা? গুপ্ত সাম্রাজ্যের কিছু পেলেও পেতে পার।

মিঃ সেন জবাবে মৃদু হাসেন শুধু। জিনিষগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে উঠে দাঁড়ান তিনি!

মিঃ বাগচী বলেন—

তাহলে সূত্র ধরবার মত কিছু পাওয়া গেল না?

না স্যার।

চল তাহলে—

দু'এক পা এগিয়ে হঠাৎ মিঃ সেন চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন—

ওঃ, হোয়াট এ ফুল আই এম। আমি—

মিঃ সেন কথা আর শেষ করেন না। মিঃ বাগচী আবার কৌতুক কণ্ঠে বলেন—

কি হল আবার সেন? নিজের সম্বন্ধে সক্কাল্ বেলায় নিজেই সার্টিফিকেট দিচ্ছ কেন?

মিঃ সেন ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ওয়াটার প্রুফটা খুলে সামনে মেলে পরীক্ষা করেন। তারপর মিঃ বাগচীর দিকে ঘুরে সেটিকে মেলে ধরা অবস্থায় দেখান।

মিঃ বাগচী দেখে নিয়ে বলেন—

তাহলে এরই একটা অংশ আমরা আগে দেখেছি।

হ্যাঁ স্যার। আমরা যে ধারণা করে এসেছিলাম সেটা ঠিক। কিন্তু সোনা মণ্ডলটি কে?

দেখা যাক। তুমি এক কাজ কর। এই ওয়াটার প্রুফটাকে

ল্যাবরেটারীতে পাঠাও। আর আমাদের কাছে যে ছেঁড়া অংশটা আছে, সেটা মিলিয়ে দেখ।

দুজনে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি তখনও দাঁড়িয়েছিল। যে লোকটি প্রথম এসে ঘরের অধিবাসীর পরিচয় দিয়েছিল, তাকে মিঃ বাগচী কাছে ডাকেন প্রশ্ন করেন—তোমার নাম কি?

আজ্ঞে, হরিপদ মাইতি।

কি করা হয়?

ইউনিয়ন কোম্পানীতে ফিটারের কাজ করি।

তুমি সোনা মণ্ডলকে কতদিন থেকে চেন?

তা প্রায় বছর আড়াই হবে।

সোনা মণ্ডলের কি কাজ ছিল জান?

না বাবু। সোনা কোনদিন বলে নি, আর আমিও জিজ্ঞেস করি নি।

কি রকম আলাপ ছিল তোমার সঙ্গে?

আজ্ঞে, সোনা ত সকালে বেরুত, আর সেই রাতে ঢুকত। আমার নাইট ডিউটি থাকলে যা দেখা হত। আর মাঝে মাঝে দিনে দেখা হ'ত। আলাপ তাই খুব বেশী ছিল না।

তাহলে সোনা মণ্ডলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে পারছ না।

আজ্ঞে না।

ওর সঙ্গে কথা বলার সময় কমলা বলে কারও নাম শুনেছ?

না। সে রকম কারও নাম শুনেছি বলে মনে পড়ছে না!

আর নারুবাবু?

এ নামটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। তবে ঠিক বলতে পারছি না।

মিঃ বাগচী বিশেষ কিছু জানতে পারেন না হরিপদের কাছ থেকে। মিঃ সেনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন—

সেন, তোমার কিছু জানার আছে ?

মিঃ সেন চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে জানান যে, নেই। তারপর অনেকটা যেন নিজের মনে বলেন—

সনাতন তাহলে সেদিন সঙ্গে ছিল না। সনাতন—

মিঃ সেনের কথায় হরিপদ বলে--আজ্ঞে!

তোমাকে কিছু বলছি না।

না ঐ নামটা—

নামটা! তুমি সনাতন বলে কাউকে চেন নাকি ?

আজ্ঞে, সোনারই আরেকটা নাম সনাতন। আমরা সোনা বলে ডাকি।

...গাড়ীতে ফিরতে ফিরতে মিঃ সেন, মিঃ বাগচীকে বলতে থাকেন—স্যার, এখন কমলাকে খুঁজে পাওয়া খুবই দরকার। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাকে ?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, তাকেও না সরিয়ে ফেলে সনাতনের মত ? আমাদের লোকদের আরো ছড়িয়ে পরতে বলো।

মিঃ সেন বলেন—

সনাতনের ঘরে লক্ষ্য করেছেন, নতুন জামা কাপড়। আর যে দেশী মদ খায়, তার কাছে দামী বিদেশী মদ ছিল।

লক্ষ্য করেছি এবং কার দৌলতে 'য়েছে বুঝতে পারছি।

গাড়ী আস্তে আস্তে এগোতে থাকে লালবাজারের পথে। মিঃ সেন বলেন—

না, মিস রায়কে আবার জিজ্ঞেস করে দেখি ওনাকে যে জায়গায় রেখেছিল, সে জায়গাটার সামান্যতম হদিশ দিতে পারেন কিনা ? অফিস থেকে সনাতনের ফটোটাও আইডেন্টিফাই করিয়ে

কনফার্ম হ'তে হবে। আমাদের ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি ডেভলপ নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতক্ষণে।

গাড়ী তাঁদের লালবাজারে পৌঁছে দেয়। মিঃ সেন, দ্রুত তাঁর কর্তব্য সেরে নিয়ে পাপিয়াদের বাড়ীর দিকে রওনা হন।

তখন পাপিয়াদের বাড়ীর বসবার ঘরে রমেন্দ্রবাবু বসে কাগজ পড়ছিলেন। আরেকটি সোফায় বসে পাপিয়া একটা সোয়েটার বুনছিল। মিঃ সেনকে বাহাত্বরের সঙ্গে আসতে দেখে রমেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাস্থ নেত্রে তার দিকে চান।

মিঃ সেন মৃত্বহাসি মুখে এনে বলেন—

আরেকবার একটু ট্রাবল দিতে এলাম মিঃ রায়।

তারপর পাপিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন—মিস রায়, আমার আর একটা কথা জানবার আছে।

বলুন।

মিস রায় আপনাকে যেখানে রেখেছিল, সে জায়গাটার কোন রকম আইডিয়া কি আপনি দিতে পারেন—যতটুকু সামান্যই সেটা হোক না কেন?

মিঃ সেন সরাসরি কাজের কথায় নেমে পড়েন।

না।

মিস রায় একটু ভেবে বলুন, হয়ত চেষ্টা করে কিছু দেখেও থাকতে পারেন, বা এমনও হতে পারে, আপনি কোন কিছুকে আন-ইম্পরটেণ্ট ভেবে বলেন নি আমাকে।

না, সে রকম কিছু—

ভালো করে ভাবুন মিস রায়।

জানলা সে ঘরে একটাই ছিল। তাও সেটা বন্ধই থাকত। তাই তার ফাঁক দিয়ে কিছু নজরে আসেনি। আমি—আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না—

মানে, কোন রকম—

আমি যে ঘরটায় ছিলাম, সেখানে পাউডারের গন্ধ পেতাম।

পাউডারের গন্ধ! তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে কোন পাউডারের কারখানার পাশে কোন ঘরে আপনাকে রেখেছিল। এত বড় কথাটা আমাকে জানান নি মিস রায়।

মানে আমি ভেবেছিলাম—

এটা একটা বিরাট সূত্র মিস রায়। এান ওয়ে, ছবিটা দেখে বলুন ত এটা সনাতনের কিনা?

হ্যাঁ।

কথাটি জেনেই মিঃ সেন কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান। একটু অবাক হয়ে রমেন্দ্রবাবু আর পাপিয়া মিঃ সেনের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।

সেই দিন রাত্রি বেলা। তখন সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে।

ভিখারীটা তারস্বরে ভিক্ষা করে চলেছে—এ বাবু উ-উ। দুটি পয়সা দে-এ-এ।

ভিখারীটা বলতে বলতে রাস্তার উপর দিয়ে নিজের পঙ্গু নিম্নাঙ্গটা মাটিতে ঘষড়ে নিয়ে চলে। গলিটাতে কি কারণে কয়েকটি আলো সেদিন জ্বলে নি। সেই স্বল্পালোকিত পাড়ায় প্রাণচিহ্ন খুব কম। যে যার কাজে ব্যস্ত। কারো দিকে কেউ লক্ষ্য করে না।

একপাশে একতলা জীর্ণ একটা বাড়ী। বিরাট ঘেরা বাগানের পাশে যেন একা পড়ে আছে। আর তারই ওপাশে একটা সেড দেওয়া ফ্যাক্টরী। এ গলিটার বিশেষত্ব এই যে, বেশ সুগন্ধ নাকে আসে এখানে ঢুকলেই।

ভিখারীটা হেঁচড়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। তার ময়লা কাপড়টা দিয়ে মুখটা মুছে নেয় একটু।

ভিখারীটার চোখ দুটো যেন অন্ধকারে একটু জ্বলে ওঠে। একটা গাড়ী আলো নিভিয়ে এসে দাঁড়ায় ঘেরা বাগানটার দেওয়ালের পাশে—যেখানে প্রায়ান্ধকার হয়ে আছে আলোর অভাবে।

কালো রঙের আম্বাসাডার গাড়ীটার ভেতরে একজনের ছায়ামূর্তি নজরে আসে। তিনবার সঙ্কেতের মত হর্ণ বাজে গাড়ীটা থেকে। ক্রমশঃ গাড়ীর সঙ্গে দূরত্ব কমতে—গাড়ীটা অজানা কোন কারণে আলো নিভিয়ে হুস্ করে চলে যায়।

বিরক্তির একটা শব্দ উচ্চারণ করে ভিখারীটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নিম্নাঙ্গে কোন রকম অসাবলীলতা রয়েছে বলে মনে হয় না। সেখান থেকে ফিরে এ পাশের মোরটার সামনে এসে শীস্ দেয়।

শীসের সঙ্কেতে নিতাই এসে তার পাশে দাঁড়ায়—স্যার ?

নিতাই-এর প্রশ্নে ভিখারীটা বলে—তোমার নোট বইতে একটা গাড়ীর নম্বর লিখে নাও।

নিতাই নোট বই বার করতে ভিখারীটা বলে—

লেখ, ডবলিউ, বি, নাইন নাইন সিক্স এইট ! এটা নিয়ে এখুনি তুমি মোটর ভেহিকলসে চলে যাও। রায় চৌধুরীকে গিয়ে বলবে আমার নাম করে যে, মিঃ সেন এখুনি গাড়ীর নাম্বারের মালিক এবং তার এ্যাড্রেসটা চেয়েছেন। জেনে নিয়ে তুমি লালবাজারে ফিরে যাও। আমার একটা কাজ বাকী আছে। চন্দ্রেশ্বর কোথায় ?

ওদিকে আছে স্যার।

তাকে আমার গাড়ীটা নিয়ে এদিকে আসতে বলো।

যে আজ্ঞে।

নিতাই চলে যেতে, ভিখারীবেশী মিঃ সেন আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে চলেন সেই বাগান আর কারখানার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একতলা বাড়ীটার দিকে।

বাড়ীটার সামনে কোন দরজা নেই। একপাশে একটা অন্ধকার গলি। তার ভেতরে মিঃ সেন ঢুকে পড়েন। বাড়ীটা একটু বড়

মনে হয়। বাড়ীর ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। একটু ঢুকতেই বন্ধ দরজায় মিঃ সেনের হাত লাগে।

মিঃ সেন তার মাথার উপর চারিদিকে তাকান। কোন বাড়ীর ছাদও সেখান থেকে নজরে আসে না। এখানে এনে পাপিয়া রায়কে রাখার সুবিধা তাহলে ছিল —একটি গাড়ী ঢুকতে পারে এমন গলি— সামনে আবার সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির দিন এখানে গাড়ী ঢুকিয়ে সাবধানে কাউকে ভেতরে ঢুকিয়ে বন্দী করে রাখলে কেউ টেরও পাবে না।

খুট। দরজা খোলার আওয়াজ হয়। মিঃ সেন দেওয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে নেন নিজেকে। একটা টর্চের আলো এসে পড়ে পথে, কিন্তু আবার নিভে যায়। দরজা বন্ধ করার শব্দের সঙ্গে চাবির আওয়াজ হয়। দরজাটায় তালা দেওয়া হল। টর্চটা আবার জ্বলে উঠে। ছায়া মূর্তিটা সেই আলোয় পথ দেখে রাস্তার সামনে এসে আলো নিভিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ সেন সন্তর্পণে এগোতে থাকেন।

রাস্তার প্রায়ান্ধকার আলোতে নজর করে দেখা গেল—ছায়া-মূর্তিটি একটি মহিলার। সে যেন এদিক ওদিক কি খোঁজে। তারপর এগিয়ে যেতে চায়।

মিঃ সেনের গম্ভীর গলা ভেসে আসে—দাঁড়াও।

অস্ফুট আর্তনাদ করে চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় সে।

মিঃ সেন গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন—তোমার নাম কমলা?

টর্চের আলোতে মিঃ সেনকে দেখে কম্পিত গলায় প্রশ্ন করে মেয়েটি—কে—কে তুমি?

আমি পুলিশ। শুনে আনন্দ পাবে কি?

মিঃ সেনের কথায় মেয়েটির হাত থেকে টর্চটা পড়ে যায় রাস্তায়। মিঃ সেন কোমর থেকে হুইসলটা বার করে তাতে ফুঁ দেন।

ঘড়িতে বেলা প্রায় পৌনে বারটা বেজেছে।

রোদ্দুরটার তেজ বেশ। পুজোর বাজনা, মাইক, উজ্জ্বল কথাবার্তা—উৎসবের আনন্দ। হাওয়াতে খুশীর কলরব। অমিতাভ, তার ঘরটাতে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে চলেছিল।

ওদিকের ঘরে টেলিফোনটা যান্ত্রিক ভাবে বাজতে থাকে। অমিতাভ কাগজটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোন ধরে—হ্যালো।

হ্যালো। অমিতাভ?

হ্যাঁ, কথা বলছি। পিউ নাকি?

হুঁ।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার ভালই? শোন, তুমি এখন কি করছ?

অমিতাভর প্রশ্নের উত্তরে পাপিয়ার গলা ভেসে আসে।

অমিতাভ জবাব দেয়—বিশেষ কিছু না। খবর সংগ্রহ করছিলাম।

ও। বর্তমানে ওটা বন্ধ করে আমাদের বাড়ীতে শীগ্রি চলে এস।

কেন?

পাপিয়ার এত্তেলায় অমিতাভ প্রশ্ন করে।

মিঃ সেন এসেছেন। উনি এখনই তোমাকে আসতে বললেন।

অমিতাভ পাপিয়ার কাছে কারণটা শুনে একটু বিস্মিত হয়। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে—ভদ্রলোকের হঠাৎ আমাকে কেন প্রয়োজন পড়ল? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। জরুরী তলব?

পাপিয়া বলে ওঠে—সেটা এসেই বুঝে যাও না বাপু।

আচ্ছা আসছি।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এস।

চিন্তিত ভাবে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে অমিতাভ। কিছুক্ষণ টেলিফোনটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে সে। যেন নিঃশব্দ

যন্ত্রটার কাছে উত্তর আশা করে। অনেক প্রশ্ন মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর দানা বেঁধে ওঠে না।

মিঃ সেনের ডাকটা অনেকটা ধাঁধার মত লাগে অমিতাভর কাছে। উত্তর মেলাতে পাপিয়াদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ে।

অমিতাভ পাপিয়াদের ড্রইং রুমটায় এসে দাঁড়ায়। মিঃ সেন তখন তার চায়ের কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখছেন। ঘরের কোণের দিকে শান্তিনিকেতনী মোড়াটার উপরে পাপিয়া বসে আছে। আর একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে চলেছে। মিঃ সেনের মুখোমুখী সোফাটায় রমেন্দ্রবাবু চুপ করে বসে আছেন। এ্যাসট্রেটা থেকে নিভিয়ে না ফেলা সিগ্রেটের টুকরো থেকে ধোঁয়াটা পাকিয়ে পাকিয়ে উপর দিকে উঠছে। পোড়া তামাকের কটুগন্ধ নাকে লাগে। কারো মুখে কোন কথা নেই। নিঃশব্দ ঘরটায় পাখাটার সূক্ষ্ম একটা আওয়াজ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিঃ সেন, অমিতাভকে দেখতে পেয়ে বলে উঠেন—

আসুন অমিতাভবাবু, আসুন। আমি ভাবছিলাম যে, আপনি হারিয়ে গেলেন না ত!

অমিতাভ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়-—হারাইনি যে তার প্রমাণ ত পেলেন। হঠাৎ আমায় ডেকে পাঠালেন কেন? আপনাদের ডাকটা ত মঙ্গল শঙ্খধ্বনি নয়।

অমিতাভর কথায় মিঃ সেন ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি নিয়ে বলেন—কেন, এমনি দেখা করতে। সে ইচ্ছেটা ত আমার হতে পারে।

ও। দেখা করার জন্যে তাহলে ডেকে পাঠিয়েছেন। আশ্বস্ত হলাম।

কেন? আপনার ভয়ের কি ছিল?

মিঃ সেন অমিতাভর কথায় প্রশ্ন করেন।

না, ভয় নয়, ভাবনা হয়েছিল আর কি।

অমিতাভ না দমে গিয়ে জবাব দেয়।

মিঃ সেন, অমিতাভর জবাবে সশব্দে হেসে ওঠেন। রমেন্দ্রবাবু অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে বলেন—বস অমিতাভ।

অমিতাভ রমেন্দ্রবাবুর কথায় আসন গ্রহণ করে। মিঃ সেন তাকে দেখতে থাকেন—অমিতাভ অস্বস্তি অনুভব করে।

একটু ক্ষণের নিঃস্তব্ধতা। মিঃ সেন, তাঁর ক্লান্তি মাখান মুখটাতে রুমালটা ঘসে নিয়ে অমিতাভকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

ডেকেছি কেন জানেন?

না। সে বিদ্যা জানা নেই।

অমিতাভর জবাবটা নিজের কাছেই একটু খারাপ শোনায়।

মিঃ সেন আবার মৃদু হাসেন। বেশ যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ঘরের উপস্থিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মিঃ সেন ভারী গলায় বলে ওঠেন—শুভেনবাবুর খুনীকে ধরতে পেরেছি।

চমক দিয়ে কথাটা সকলের মনে বিদ্যুৎ হানে যেন। পাপিয়া সচকিত হয়ে মুখ তুলে চায়। রমেন্দ্রবাবু সোজা হয়ে বসেন। অমিতাভর শরীর ঋজু হয়ে ওঠে।

মিঃ সেন একটু থেমে আবার বলেন—

শুধু শুভেনবাবুর নয়—বিকাশ ঘোষের খুনীও।

কে? কে?

প্রশ্নটা চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। মিঃ সেনের দিকে চোখগুলো নিবদ্ধ হয় উত্তরের প্রত্যাশায়।

মিঃ সেন অমিতাভর দিকে চেয়ে বলেন—

আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না, তাই না?

আকস্মিকতায় হতভম্ব অমিতাভ মাথা নেড়ে জানায় যে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

পাপিয়া উদ্‌গ্রীব হয়ে বলে ওঠে—

কে? মিঃ সেন বলুন। প্লিজ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ সেন বলুন, কে?

রমেন্দ্রবাবুকেও যেন উত্তেজিত মনে হয়।

মিঃ সেন, সকলের মুখের দিকে আবার চান। নিরুদ্ধশ্বাসে উন্মুখ হয়ে থাকে সকলে। জিজ্ঞাসা তাদের একটা—কে হতে পারে?

মিঃ সেন গলাটা পরিষ্কার করে বলেন—তার নাম হচ্ছে-

ঘরের মধ্যে নামটা যেন আরেকপ্রস্থ বিদ্যুৎ হানে। পাপিয়া আর রমেন্দ্রবাবু চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে অমিতাভর দিকে চেয়ে থাকেন। যেন কিছু কথা আশা করেন তাঁরা।

অমিতাভ অসহায় ভাবে তাঁদের সকলের দিকে চেয়ে বলে—

আ···আমি, মানে—

অমিতাভ কথা শেষ করতে পারে না। মিঃ সেন বলেন—

আপনি ধারণাও করতে পারেন নি, তাই না? সেটা আমি জানি, —ভালো করেই জানি—তাই আপনাকে ডেকে এনে নাটকীয়তা বাড়াতে হল।

মিঃ সেন চুপ করেন। ঘরে স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। অমিতাভ হতবাক হয়ে থাকে। পাপিয়া আস্তে আস্তে চোখ নামায়। রমেন্দ্রবাবুও নিঃশব্দে বসে থাকেন। সকলে যেন নিজের মনে ঘটনাটা সাজাতে চেষ্টা করেন।

ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে মিঃ সেন বলে ওঠেন—

সমস্ত কিছু সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা কৌতূহলী হয়েছেন—ধরতে পারলাম কি করে? আপনাদের কৌতূহল মেটাতে সংক্ষেপে যতটা সম্ভব বলছি।

কেউ কোন কথা বলে না। তাদের চোখগুলি আবার মিঃ সেনের মুখের দিকে নিবদ্ধ হয়। মিঃ সেন একটু থেমে বলেন—

কেসটার দোষীকে ধরতে পেরে আমারও কম আনন্দ হচ্ছে না।

কারণ, এই আমার পুলিশী জীবনে প্রথম কেস—যেটিতে সাফল্যের সঙ্গে যবনিকা টানতে পারলাম। তাহলে প্রথম থেকে বলি, কেমন?

মিঃ সেন তাঁর আখ্যান শুরু করলেন। প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

শুভেনবাবু খুন হওয়ার পর আমরা খবর পেয়ে পৌঁছালাম। বৃষ্টির দিন আকাশ মেঘলা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা দেখলাম, শুভেনবাবুকে কর্ডের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে দুজন লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে একজনের ওয়াটার প্রুফের অংশ শুভেনবাবুর মুঠিতে পাই। তারপর একটা পেরেকের প্যাকেটের মধ্যে হাপ-আউন্স মত কোকেন আর কয়েক টুকরো সোনা পেয়ে গেলাম খুঁজতে খুঁজতে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ দুটো কোথা থেকে এল বলুন ত? শুভেন—

ধমেন্দ্রবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ সেন বলে ওঠেন—আমি বলছি মিঃ রায়। একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। যাই হোক, সেদিন আবহাওয়া খুবই সাহায্য করেছিল দুষ্কৃতকারীদের, এটা ঠিক। আমরা আর বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না সেদিন, যাতে করে কাউকে সন্দেহ করা যেতে পারে। তবে বিকাশবাবুর চরিত্রটা প্রথম দিনই একটু নজরে লাগে আমাদের। তারপর হঠাৎ অমিতাভ বাবু মিস রায়কে কেউ যে কিডন্যাপ করেছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। জটিলতা তাতে আরো একটু সৃষ্টি হল। মাথায় তখন এল আরেক চিন্তা—খুনের জন্য কিডন্যাপিঙ। না কি কিডন্যাপিঙের জন্য খুন? যাই হোক, বৃষ্টি থাকার দরুণ সেদিন আমাদের কুকুর জ্যাকিকে কাজে লাগাই নি—কেন না, জলে গন্ধ নষ্ট করে দেয়।

শুভেনবাবু খুন হ'লেন কেন? কাদের দ্বারাই বা খুন হলেন? কোকেন আর সোনা কোথা থেকে এল? মিস রায়ই বা এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

প্রশ্নগুলো যেন সকলকেই করেন মিঃ সেন। উপস্থিত মানুষ-

গুলোর দিকে চেয়ে মিঃ সেন একটু পাশ ফিরে বসেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করেন—সলিসিটরের কাছ থেকে আমি শুভেনবাবুর উইলের বিষয়টা জেনে নিলাম। তাতে রূপেনবাবু সন্দেহের আওতায় প্রথম দিকটায় পড়েছিলেন, আর বিকাশবাবু যদিও তিনি খুন করে না থাকেন, মিস রায়কে সরাতে পারেন। এই কনক্লুশনে আসা যেতে পারে। শুভেনবাবুর খুনের একটা দিক দেখে বোঝা যায় যে, খুনী দুজন প্রস্তুত হয়েছিল, শুভেনবাবুকে তারা মারবেই। তা না হলে কর্ডটা তারা কাছে রাখত না। আর সেদিন শুভেনবাবুর বাড়ীতে এসেই শম্ভুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শুভেনবাবুকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। মিস রায় যে তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন, সেটা খুনী দুজন ধারণা করে নি। সেইজন্যে সঙ্গে সঙ্গে তারা মিস রায়কে সরিয়ে নিয়ে যায় এই ভেবে যে, মিস রায় হয়ত দেখে ফেলেছেন কিছু। মিস রায়কে তারা জীবিত রাখত না। কিন্তু সেটা রেখেছিল অন্য একটা কারণে—মিস রায় সেজন্য ধন্যবাদ দিন ভগবানকে এবং সেই কারণেই মিস রায় জীবিত ছিলেন। যাই হোক, দুটো ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা মুখ্য হয়ে দাঁড়াল—কেন?

মিঃ সেন একটু বিশ্রাম নেবার জন্য চুপ করেন। মুখটায় আবার রুমাল ঘসে নিয়ে বলেন—বাহাদুরকে ডেকে এক গ্লাস জল দিতে বলুন ত। কাল রাত থেকে আজ পর্যন্ত যে ধকল গেছে—তাতে আমি বড্ড টায়ার্ড হয়ে পড়েছি।

রমেন্দ্রবাবু বাহাদুরকে ডেকে মিঃ সেনের জন্য ফ্রীজ থেকে এক গ্লাস জল আনতে বলে দেন! বাহাদুর জল দিয়ে গেলে, মিঃ সেন জল খেয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। কেন? এই মুখ্য প্রশ্নটা সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলাম।

মিস রায়ের ডিসএপিয়ারেন্সের সূত্র ধরে আমি গাড়ীর খোঁজ নিলাম। জানতে পারলাম, একটি কালো রঙের গাড়ী যার প্রথম

হুটো সংখ্যা নাইন এণ্ড নাইন। এবং এও জানতে পারলাম, শুভেনবাবুর খুন হওয়ার সময়টুকুর মধ্যে বিকাশকে দেখা গেছিল ঘটনাস্থলে। তাহ'লে বিকাশ ওখানে গেছিল কেন? আমি বিকাশের পেছনে লোক লাগালাম—নিজে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গেলাম তার বাড়ীতে। কিন্তু বিকাশ ফেরার হল।

আবার প্রশ্ন এসে দাঁড়াল—কেন? খবর নিয়ে জানা গেল, কুখ্যাত এক গুণ্ডার সঙ্গে বিকাশ জড়িত আছে। বিকাশ যদি খুন না করে থাকে, তাহলে এভাবে ফেরার হওয়ার কারণ কি? বিকাশেরই বাড়ীতে একটা চিঠি পেলাম, সেটি অনেকটা ব্ল্যাকমেইল ধরণের লেখা। হুটো নামও পেলাম—কিন্তু সে হুটো কাজে লাগল না। বিকাশকে প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিশেষ ভাবে। আমাদের লোক বিকাশকে পেলেও, সে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তারপর বিকাশও খুন হল।

অবশ্য বিকাশকে যদি তখনই পেয়ে যেতাম, কেসটা এতদূর গড়াত না। বিকাশের কাছে একটা চিঠি পেলাম, যেটা বিকাশের যে চিঠির কথা বলেছি, তারই উত্তর বুঝতে পারলাম। প্রশ্ন এল, এবার বিকাশের খুনটা শুভেনবাবুর খুনের সঙ্গে জড়িত কিনা! এরপরই মিস রায়কে নাটকীয় ভাবে বাসে উদ্ধার করলেন অমিতাভবাবু। আমরা একটু আশান্বিত হলাম। মিস রায় হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারবেন। মিস রায় সম্পূর্ণভাবে সে রকম কিছু না করলেও নারু, সনাতন, কমলা তিনটি নাম বললেন। আর বিশেষ কিছু বললেন না। কিন্তু সেই সনাতনও খুন হল।

উদগ্রীব হয়ে শোনে সকলে। মিঃ সেন একটু থামেন আবার। তারপর আবার শুরু করেন—এই সনাতনের পরিচয় আমরা একটু আশাতীত ভাবে পেয়ে যাই। কিন্তু আমি সন্দেহ করেছিলাম একটি সূত্রের উপর নির্ভর করে, সেটা হচ্ছে গাড়ীতে লিক থাকার দরুণ তেল পড়ত। সে দাগ বিকাশের বেলাও দেখেছিলাম। যাই

হোক, শুভেনবাবুর খুনের সহকারী কে জানতে পারা গেল। কিন্তু জীবিতাবস্থায় নয়। তবু শুভেনবাবু আর বিকাশের খুনের যোগসূত্র পাওয়া গেল। বিকাশ, শুভেনবাবু আর সনাতনের খুনীকে ব্ল্যাক-মেইল করেছিল। কিন্তু সে কে? মাথায় তখনই এক চিন্তা এল, তাহলে এবার কি কমলার পালা? মিস রায়ের কাছে ছুটে এলাম আবার। মিস রায় স্থানটা না বলতে পারলেও তার সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়ে দিলেন। পাউডারের গন্ধ পেতেন সব সময়। তাহলে মিস রায়কে কোন পারফিউমারী ওয়ার্কসের পাশাপাশি কোন এক জায়গায় রাখা হয়েছিল। এরপর আর কোন বেগ পেতে হল না। যা আশা করেছিলাম তাই হল। গাড়ীর পুরো নম্বরটাও পেয়ে গেলাম। কার গাড়ী জানতে পেরে খুনীকে ধরা সম্ভব হল।

মিঃ সেন তার আখ্যান শেষ করে সিগারেটটা ধরিয়ে নেন। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের আর কিছু জানার থাকে ত প্রশ্ন করতে পারেন।

রমেন্দ্রবাবু একটু নড়ে চড়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন—মিঃ সেন, শুভেন খুন হল কেন তা ত বললেন না। আর আগেই ত আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, কোকেন আর সোনা শুভেনের কাছে এল কেন?

মিঃ সেন সিগারেটের ধোঁয়াটা ছেড়ে জবাব দেন—খুব সোজা। ঐ কোকেন আর সোনার জন্যে।

তবে কি শুভেন—

রমেন্দ্রবাবুর উদ্গত প্রশ্নে আবার বাধা দিয়ে বলেন মিঃ সেন—না, তিনি কোন ঐ ধরণের স্মাগলারের দলে ছিলেন না।

তবে?

ও দুটো জিনিষ একটু ঘটনাচক্রে শুভেনবাবুর হাতে এসে পড়েছিল। আর সেইজন্যই ব্যাপারটা অশুভ হয়ে দাঁড়ায় শুভেনবাবুর পক্ষে।

সেটা কি রকম?

রমেন্দ্রবাবু মিঃ সেনের কথায় আবার প্রশ্ন করেন।

কোকেনের নেশা করতেন রূপেনবাবু। মানে শুভেনবাবুর পার্টনার। একদিন রূপেনবাবুকে ঐ প্যাকেট ডেলিভারী দেওয়া হয়, তাঁদের কারখানায় এবং ভুলক্রমে জিনিষটা চলে যায় শুভেন-বাবুর কাছে।

কিন্তু মিঃ সেন, রূপেনবাবুও ত বিক্রি করতে পারতেন?

রমেন্দ্রবাবুর প্রশ্নে মিঃ সেন সিগারেটে টান দিতে দিতে বলেন—না, যারা ঐ ধরণের নেশা করেন, তাঁরা সহজে কিছু বলেন না। এই প্রকৃতির নেশার সুযোগে অনেকে সর্বসান্ত হয়েছেন—অনেকে প্রচুর ব্যয়ও করেছেন। অনেকের নাকের সামনে এই জাতীয় নেশার বস্তু নাচিয়ে নাচিয়ে নেশার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা প্রচুর টাকাও নিয়েছে। যাই হোক, ঘটনার সূত্রপাতে রূপেনবাবু, শুভেনবাবুর কাছে তাঁর নেশার জিনিষটা চাইলে, শুভেনবাবুর কাছে সমস্ত কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। জিনিষটা কোথা থেকে এসেছে তা জানতেন শুভেনবাবু। সুতরাং কে পাঠিয়েছে তাও তাঁর জানা হয়ে যায়।

মিঃ সেন সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে এ্যাসট্রেটাতে নিভিয়ে ফেলে দেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিতে দিতে বলেন—ব্যবসার খাতিরে ঐ সাপ্লায়ার বা পরিবেশকের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের ছিল। যাই হোক, ব্যাপারটা শুভেনবাবু জেনে ফেলেছেন জানতে পেরে শুভেনবাবুর সঙ্গে দুষ্কৃতকারী একটা ব্যবস্থায় আসতে চায়। মনে হয়, টাকাই দিতে চেয়েছিল শুভেনবাবুকে। কিন্তু শুভেনবাবু কোন কিছুতেই রাজী না হয়ে বলেন যে, তিনি এ ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে দেবেন। তখনই খুনী শুভেনবাবুকে মেরে ফেলার কথা ভাবে এবং তৈরী হয়। প্রথম সুযোগেই দুজনে মিলে শুভেনবাবুকে খুন করে। আর মিস রায়কে সরিয়ে ফেলে। গাড়ীটা কোইন্সিডেন্টলি তাদের কাজে লাগে। ওদের

আবহাওয়া ত সহায়তা করেছেই, উপরন্তু বিরল বসতিপূর্ণ শুভেনবাবুর বাড়ীর এলাকাও সাহায্য করে।

মিঃ সেন একটু থামতে রমেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করেন। তাঁর ঔৎসুক্য যেন কমতে চায় না—তাহলে পাপিকে ওরা কোথায় সরিয়ে দিচ্ছিল ?

মিঃ সেন এবারে মৃদু হেসে বললেন—কোথাও না। মিস রায়কে তারা ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছিল। যখন খুনীর মনে হয়েছিল যে, মিস রায় কোন কিছুই জানেন না এবং সেটাই ওদের ভুল।

সকলে বিস্মিত হয় মিঃ সেনের কথায়। অমিতাভ এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিল। এবার সে প্রশ্ন করে—কেন পিউকে ওরা ছেড়ে দিল ?

মিঃ সেন অমিতাভর দিকে চেয়ে হাসি নিয়ে জবাব দেন—নইলে ভাবুন না আপনি অতিনাটকীয় ভাবে বাসে মিস রায়কে উদ্ধার করলেন। সেটা কি এক্ষেত্রে সম্ভব! কোন দুষ্কৃতকারী সেটা করত না। মিস রায়কে আপনি যে অবস্থায় বাসের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছেন, সেই অবস্থায় হয় আপনার বাড়ীর সামনে অথবা মিস রায়ের বাড়ীর সামনে তাকে পাওয়া যেত।

অমিতাভ মিঃ সেনের কথায় বিস্মিত হয়। সে আবার বলে—সেটা কি রকম ?

সেটা একটা অদ্ভুত অথবা সুন্দর মনস্তত্বের ব্যাপার বলতে পারেন। আপনার বন্ধু সুপ্রিয়বাবু তিনটে খুনের আসামী হলেও বন্ধু-প্রীতির উদাহরণ রেখেছেন এবং সেদিক দিয়ে তিনি সিন্সিয়ার। সেই কারণে মিস রায়কে ছেড়ে দিয়েছেন। যখন সুপ্রিয়বাবু জানতে পারলেন যে, আপনার এবং মিস রায়ের মধ্যে একটা সুইট এটাচমেণ্ট আছে—মানে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা—আশা করি আমি কি বলতে চাইছি আপনারা বুঝতে পারছেন।

মিঃ সেন স্মিত হাসি নিয়ে শেষ কথা কটি অমিতাভর দিকে চেয়ে

বলেন। পাপিয়া লজ্জাবনত হয়ে যায়। রমেন্দ্রবাবু উসখুস করে ওঠেন। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন—

যাক গে মিঃ সেন, ওটা ওদের ব্যাপার। মানে আমরা ইয়ে—আমার সামনে বললে ওরা—মানে আপনি যা বলছিলেন মিঃ সেন।

রমেন্দ্রবাবু যেন সামলে ওঠেন। মিঃ সেন মৃদু হেসে পাপিয়ার দিকে একপলক চেয়ে নিয়ে আবার শুরু করেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আপনাদের সম্পর্কটা জানার পর সুপ্রিয় বাবু অমিতাভকে আঘাত দিতে চান না। আর তখনই মিস রায়কে ছেড়ে দেবার কথা চিন্তা করেন। অবশ্য তাব আগে মিস রায় কিছু জানেন কিনা যাতে করে হাতে দড়ি পড়বে—সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নেন। তারপরের ঘটনা ত আপনারা জানেন। সত্যি সুপ্রিয়বাবু খুনী হলেও তাঁর এই ভালো দিকটার জন্যে মিস রায় জীবিত রয়েছেন এখনও। আগেই বলেছি এটা সুপ্রিয়বাবুর একটা মারাত্মক ভুল। ধরা তিনি পড়তেনই। তবে এত শীঘ্রি নয়। কারণ, রূপেনবাবুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগই ধরিয়ে দিত।

মিঃ সেন চুপ করেন। ঘরে আবার স্তব্ধতা বিরাজ করে। অমিতাভ ভাবে সুপ্রিয়র কথা—শান্ত, শিষ্ট, সুপ্রিয়। মনে পড়ে শুভেনবাবুর খুন হওয়ার দিনটির কথা। খবর পাওয়ার পর সুপ্রিয়কে জানাতে ও কতকগুলো প্রশ্ন ঔৎসুক্যের সঙ্গে করেছিল। তাহলে, ঘটনার চরিত্রগুলোর সঙ্গে অমিতাভর যোগাযোগ সুপ্রিয় আশা করে নি। তাই অতটা উৎসুক হয়ে পড়েছিল সে। স্তব্ধতা ফেঙে অমিতাভ মিঃ সেনকে উদ্দেশ্য করে বলে—

আচ্ছা মিঃ সেন, সুপ্রিয় ত প্রথমেই পিউকে সরিয়ে দিতে পারত একেবারে? আর সেদিন মানে চিনিকাকুর খুন হওয়ার দিন সুপ্রিয় আমার কাছে গেছিল কেন?

মিঃ সেন, অমিতাভর প্রশ্নে আস্তে আস্তে জবাব দেন—

হ্যাঁ। অন্যক্ষেত্রে হলে হয়ত তাই হ'ত। কিন্তু শুভেনবাবুর

খুনটাই সুপ্রিয়বাবুর প্রথম হাতে খড়ি—সেইজন্যে দ্বিতীয় খুনটা সঙ্গে সঙ্গে করার সাহস হয় নি। অবশ্য বিকাশবাবুকে খুন করার পর অনেকটা আত্মবিশ্বাস এসে যায় সুপ্রিয়বাবুর। সেটা মঙ্গলই হয়েছে মিস রায়ের ক্ষেত্রে—এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নেই। মিস রায়কে ছেড়ে দেওয়াটা অনেকটা চ্যালেঞ্জও বলতে পারেন। কিন্তু বন্ধুপ্রীতিটা সুপ্রিয়বাবুর ক্ষেত্রে মনস্তত্বের দিক থেকে কম বড় কথা নয়।

অমিতাভর আবার মনে পড়ে—পাপিয়াকে পাওয়া যাবার পর সুপ্রিয়র সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হওয়ায়, সুপ্রিয় ঐ 'চ্যালেঞ্জ' রাখার মত কি একটা কথা বলেছিল বটে।

মিঃ সেন বলে চলেন—আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের আগে একটা প্রশ্ন করব। আপনার কাছে সুপ্রিয়বাবু কটার সময় এসেছিলেন ?

অমিতাভ একটু থমকে যায়। তারপর আস্তে আস্তে জবাব দেয়—আমার ঠিক—মানে ঘড়ি তখন দেখি নি। তাছাড়া দিনটা মেঘলা ছিল। বুঝতে পারিনি।

তখন চারটে বেজেছিল।

মিঃ সেনের কথায় অমিতাভ দ্বিধায় জবাব দেয়—হতে পারে।

মিঃ সেন অমিতাভর জবাবে বলেন—চমৎকার একটা সুযোগ সুপ্রিয়বাবু নিজের নির্দোষিতা প্রমাণে কাজে লাগিয়েছিলেন। মেঘলা দিনে সময় বিভ্রাট ঘটতে পারত। হি ইজ অলসো ভেরি ক্লেভার। যাই হোক, আপনি এবার ভেবে দেখুন ত, খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুভেনবাবুর বাড়ী পৌঁছাবার পর সন্ধ্যা হয়ে যায় নি ?

হ্যাঁ।

অমিতাভর জবাবে মিঃ সেন একটু মৃদু হাসেন।

রমেন্দ্রবাবু বলেন—কিন্তু বিকাশকে সুপ্রি আই মিন সুপ্রিয় খুন করল কেন ?

মিঃ সেন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা এসট্রেতে

ফেলে দিয়ে জবাব দেন—বিকাশবাবুর খুন হওয়ার কারণ একটাই। শুভেনবাবুর মত—কোকেন আর সোনা।

রমেন্দ্রবাবু ঠিক বুঝতে পারেন না, বলেন—কি রকম?

সিগারেটটা টেনে ধোঁয়া ছেড়ে মিঃ সেন বলেন—শুভেনবাবু দোষীকে সাজা দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। আর বিকাশ দোষীকে কামধেনু মনে করে দোষীর দুর্বলতার সুযোগ নেয়। তাই দুজনকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি আপনাদের—যখন শুভেনবাবুর কাছে সুপ্রিয়বাবু একটা বোঝাপড়ার জন্য আসেন, বিকাশ সেই সময় মামার কাছে কোন একটা কাজে উপস্থিত হয়—আড়াল থেকে শুনে ব্যাপারটা বুঝে সুপ্রিয়বাবুকে ব্ল্যাকমেইল করে নিঙরোতে শুরু করে।

একটু থেমে মিঃ সেন বলে ওঠেন—অবশ্য এক্ষেত্রে আপনাদের প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে শুভেনবাবুদের সম্পর্ক কি? সুপ্রিয়বাবুর পোলট্রি বিজনেসের সঙ্গে অর্ডার সাপ্লায়ারের কারবার করতেন। আর রূপেনবাবুর নেশার মাল-মশলা তিনিই জোগাড় করে দিতেন। সুপ্রিয়বাবুর কোকেন আর স্মাগলিঙের ব্যবসা ছিল। যাই হোক, এরপর শুভেনবাবুর খুন হওয়ার দিন বিকাশ ঘটনাস্থলে পৌছে ব্যাপারটা বুঝে নেয় যে, সুপ্রিয়বাবু খুনটা করেছেন। সে সুপ্রিয়বাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাতে সুপ্রিয়বাবু উপায়ান্তর না দেখে লাভার্স লেনে বিকাশের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেন। আর তখনই চিঠির ভাষা থেকে আমাদের ধারণা হয়, বিকাশ যাকে ব্ল্যাকমেইল করছিল সে একজন ব্যবসায়ী। আমাদের ধারণাই ঠিক। বিকাশ জানত সব। মিঃ সেন চুপ করেন এবং সিগারেটটায় টান দিতে থাকেন।

পাপিয়া নিশ্চল অবস্থা থেকে মৃদুস্বরে বলে—তারপর—

তারপর? তারপর ব্যাপারটা খুবই ছোট। মিস রায়কে ছেড়ে দেওয়ার পর, সুপ্রিয়বাবু দেখেন, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। মিস

রায় ত নাম বলে দেবেন সুপ্রিয়বাবুর সাগরেদদের। সুতরাং সনাতনকে বিকাশের মত সরান হল একইভাবে ষ্ট্যাব করে—বাঁ পাঁজরায় ছোরাটা মেরে। আমার তখনই মনে হল, এরপর নিশ্চয়ই কমলার পালা।

পাপিয়ার দিকে চেয়ে মিঃ সেন আবার বলেন—আবার আপনার কাছে ছুটে এলাম জানতে। আপনাকে কোথায় রেখেছিল, তার একটা যে কোন ধারণা পেতে। আপনার কথায় জানলাম, পাউডারের গন্ধ আপনি সব সময় পেতেন। সুতরাং আপনি যেখানে ছিলেন, সে জায়গাটার কাছাকাছি পারফিউমারী ওয়ার্কশপ আছে। ব্যস, তারপর আর বেশী বেগ পেতে হল না।

মিঃ সেন থামতেই রমেন্দ্রবাবু বলেন—সুপ্রিয় স্বীকার করেছে কি ?

হ্যাঁ। আপনাদের যা এতক্ষণ বললাম, সেটা আমার চিন্তা, সুপ্রিয়বাবুর স্বীকৃতি, রূপেনবাবু আর কমলার জবানবন্দী সবকিছু মিলিয়ে। অবশ্য তাছাড়া সুপ্রিয়বাবুর রক্তমাখা পোযাক, ছোরা আমরা পেয়েছি। উপরন্তু সুপ্রিয়বাবুর পোলট্রিতে প্রচুর পরিমাণে কোকেন উদ্ধার করেছি। সুতরাং—

মিঃ সেন যেন হাপ ছাড়েন এতক্ষণ বাদে। তারপর মৃদু হাসি মাখিয়ে অমিতাভকে বলেন—দেখবেন অমিতাভবাবু শুভ দিনটায় আপনি ভুলবেন না যেন।

পাপিয়া লজ্জারুণ মুখে বাড়ীর ভেতর দিকে পালিয়ে যায়। অমিতাভ একটু অস্বস্তি বোধ করে। রমেন্দ্রবাবু প্রথমে যেন বুঝতে পারেন না। তিনি বলেন—কিসের শুভদিন ? উঁ। ও বুঝেছি। মানে—মিঃ সেন, একটু বসুন, ইয়ে কিছু খেয়ে যাবেন।

মিঃ সেন একটু শব্দ করে হেসে উঠে ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়ান, বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রায়। আজ চলি। আগেই বলেছি, ভীষণ টায়ার্ড। কেসটার সুরাহা করতে পেরে একটু আনন্দও হয়েছে।

প্লিজ এক্সিউজ মি। আমি কোয়ার্টারে গিয়ে বিশ্রাম নেব। আচ্ছা নমস্কার।

অমিতাভর দিকে ফিরে বলেন—চলি অমিতাভবাবু। কিন্তু যা বললাম মনে রাখবেন।

গট গট করে মিঃ সেন মৃদু হাসি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান। রমেন্দ্রবাবু আর অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। পাপিয়া ঘরে আসে আবার। জিজ্ঞেস করে—মিঃ সেন চলে গেছেন?

হ্যাঁ।

অমিতাভ জবাব দেয়।

রমেন্দ্রবাবু গলাটা আবার আওয়াজ করে পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন—এ হুম। অমিতাভ ইয়ে তোমরা দুজনে তাহলে বস। মানে তুমি বস। আজ এখানেই খাবে। কোন কথা শুনব না। আমি আসছি।

রমেন্দ্রবাবু ভিতরে চলে যান তাঁর স্লিপারের আওয়াজ তুলে। পাপিয়া বসে। অমিতাভও চুপ করে বসে থাকে। পাপিয়া প্রথমে বলে—এই।

কি?

শোন—

এই সময় নান্নু এসে ঘরে ঢোকে। পাপিয়া চুপ করে যায় তাকে দেখে। নান্নু ঘরের কোণে ম্যাগাজিনের বাণ্ডিলের নীচে থেকে একটা বই বার করে নিয়ে চলে যাওয়ার পথে থমকে দাঁড়িয়ে যেন দরকারী একটা কথা জানায় অমিতাভকে—কি রান্না হচ্ছে বল ত?

কি?

চিংনি মাছের কালিয়া।

কি মাছ?

চিংনি মাছ?

মাছের নাম অমিতাভ জানে না মনে করে যেন বিস্মিত হয়ে নান্নু বলে।

চিংনি মাছ কি রে? চিংড়ি বলতে পারিস না।

নান্নু যেন তার অবোধ দিদিকে ক্ষমা করে দেওয়ার মত মুখ করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

অমিতাভ সশব্দে হেসে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পাপিয়া আড় চোখে অমিতাভর দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায়। মাথার চুলের বেণীর ফিতা খুলতে খুলতে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘাড় কাত করে অমিতাভকে বলে—এই।

উঁ।

কি ভাবছ?

ভাবছি, সুপ্রিয়র কথা। ভাবছি তোমার সঙ্গে আলাপের রাতের কথা...—বেশ লাগছে।